ভারত-গৌরব গ্রন্থাবলী।

সিদ্ধার্থ

শ্রীশশিভূষণ [illegible] সেন প্রণীত।

সিটীবুক-সোসাইটি
৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার।

Printed by J. N. Bose,
Wilkins Press, College Square ; Calcutta.

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

"When any good and great work is to be done, the man who is told off to do it, is usually put through the mill with considerable severity. This is especially noticeable in the case of those who have to meet others, in order to do it rightly, they have of suffer themselves. Poets are said to learn in suffering what they teach in song. The school of sorrow and of adversity is usually found to be indispensable for others besides poets. To be able to put yourself in the place of others, you need to have been at one time actually in their position that is the lesson of INCARNATION. Had the Redeemer not been tempted in all points even as we, He had never been the Redeemer of the world" W. T. Stead.

নিবেদন

সিদ্ধার্থ প্রকাশিত হইল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে বুদ্ধদেবের জীবনের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের মধ্যে তাঁহার অলৌকিক শক্তি, তাঁহার কৃত অতিমানবিক ক্রিয়াসমূহের (miracles) কথা অথবা তাঁহার সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী বলা হয় নাই। ইহার মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মমতের বিচার এবং তুলনায় তাহার সমালোচনা করা হয় নাই।

এই প্রকার নানা বিসম্বাদী ঘটনা ও মতের পাণ্ডিত্য পূর্ণ তর্ক বিচারে, বক্ষ্যমাণ চরিতের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য উভয়ই হ্রাস হইয়া যায়। পাঠক, পুস্তক পাঠান্তে, মানস-পটে মূল আখ্যান বস্তুর একটি উজ্জলচিত্র, এবং হৃদয়ে তৎপ্রতি প্রশংসা, ভক্তি শ্রদ্ধা এবং পূজার ভাব লইয়া উঠিতে পারেন না, সুতরাং মহাজন চরিতামৃত রচনার মুল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। এই আশঙ্কায় সিদ্ধার্থের জীবনীতে কোন প্রকার তর্কবিচারের অবতারণা করা হয় নাই।

মায়াদেবী-সুত শুদ্ধোদনপুত্র রাজকুমার সিদ্ধার্থ জীব ও জগতের হিতের জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। সেই সাধনায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয়। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ জগতে মুক্তির নূতন

কথা প্রচার করিলেন। জীব ও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া শেষে তিনি স্বীয় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পবিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। এই কথাগুলি সংক্ষেপে ও সরলভাবে এই পুস্তিকায় বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সে চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা পাঠকগণ বলিবেন। ইতি।

আরা
২১শে শ্রাবণ ১৩২০



গ্রন্থকারস্য।

সূচীপত্র।

সিদ্ধার্থ

বংশ-বিবরণ।

অতি প্রাচীন কালে অযোধ্যা প্রদেশে শাকেত নগরে সুজাত নামক এক জন রাজা ছিলেন। তাঁহার ওপুর, নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ এবং হস্তিশীর্ষক নামক পাঁচটি পুত্র এবং শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা, ও জলী নাম্নী পাঁচটি কন্যা জন্মে। রাজা সুজাত দুর্ব্বলচিত্ত এবং বিলাসী ছিলেন। তাঁহার একটি বিলাসিনী স্ত্রী ছিল। উহার নাম জেন্তী। এই বিলাসিনীর গর্ভে রাজার একটি পুত্র জন্মে। তাহার নাম জেন্ত। একদা রাজা তাঁহার বিলাসিনী স্ত্রীর প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হয়েন এবং তাহার প্রার্থিত যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন বলেন। জেন্তী এই সুযোগে তাহার কোন হিতৈষিণীর পরামর্শে রাজার নিকট এই প্রার্থনা করিল যে, রাজা তাঁহার পঞ্চ পুত্রকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিউন, এবং নিজ পুত্র জেন্তকে যুবরাজ করুন।

রাজা দুর্ব্বলচিত্ত এবং বিলাসী হইলেও, সত্যব্রত ছিলেন। পাছে সত্য ভঙ্গ হয় এই ভয়ে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাসিনীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার

ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পঞ্চ পুত্রকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন। তাঁহারা পিতার আদেশ পালন করিলেন। এবং পিতৃরাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে যাত্রা করিলেন। প্রজাগণ রাজকুমারগণের অতিশয় অনুরক্ত ছিল। তাহারা রাজা সুজাতের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইল। তাঁহার পাপরাজ্যে বাস করা নিরাপদ নহে এই বিবেচনায় এবং রাজকুমারগণের প্রতি অনুরাগ ও সহানুভূতির বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাসকল রাজকুমারগণের অনুগমন করিল। কয়েক দিবস পরে তাঁহারা কাশীকোশল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারগণ অসংখ্য প্রজাগণের সহিত কাশীকোশল রাজ্যে আসিয়াছেন একথা সত্বর রাজার কর্ণে গেল। কাশীকোশল-রাজ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং নিজ রাজ্যে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। রাজকুমারগণ এইরূপে অযাচিত ভাবে আশ্রয় পাইয়া কিছুকাল নিরুদ্বেগে সেখানে রহিলেন। কিন্তু এই শান্তি অধিক দিন স্থায়ী হইল না।

রাজকুমারগণের সহিত তাঁহাদের প্রজাসকল আসিয়াছিল। প্রজাগণ তাঁহাদের একান্ত অনুরক্ত। প্রজাগণের এই অসামান্য অনুরাগ কাশীকোশলরাজের মনে সন্দেহ উৎপাদন করিল। তিনি ভাবিলেন, রাজকুমারগণ এই সকল ভক্ত প্রজার সাহায্যে তাঁহার রাজ্যে বিপত্তি

ঘটাইতে পারেন। শেষে তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার রাজ্য হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য বলিলেন। রাজকুমারগণ প্রজাসকলকে লইয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন।

এত দিনে বিধাতা তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তাঁহারা কাশীকোশলরাজ্য হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমে উত্তর দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদিন এই ভাবে গমন করিয়া তাঁহারা হিমালয়ের পাদদেশে শাকোটবনে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে মহামুনি কপিলের আশ্রম ছিল। ঋষি তপস্বীর আশ্রম স্থান, স্থানটি অতিশয় রমণীয়। নদী ও নির্ঝরিণীর নির্ম্মল স্নিগ্ধ জল, সুশ্যাম বৃক্ষ লতা, ফুল ফল, বনে মৃগয়ার পশুপক্ষী সকলই সেখানে অনায়াসলভ্য ছিল। তাঁহারা সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। পর্ণকুটীর-পূর্ণ বনস্থলী সুন্দর নগরীতে পরিণত হইল। কিছুকাল পরে নগরের প্রাচীরস্বরূপ বৃক্ষরাজি যখন অপসারিত হইল, তখন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রবলে যেন বনমধ্য হইতে এক অপূর্ব্ব নগর লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থিত হইল। রাজকুমারগণ মহামুনি কপিলের পবিত্র নামে এই নগরীর নামকরণ করিলেন। অতঃপর ইহার নাম হইল কপিলবাস্তু।

অল্পদিনের মধ্যেই কপিলবাস্তুর কথা নানা স্থানে

প্রচারিত হইল। ভ্রমণকারী এবং বণিকগণ এই নগরীর কথা প্রশংসা ও বিস্ময়ের সহিত উল্লেখ করিতে লাগিল। ক্রমে এই সংবাদ রাজা সুজাতের কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি তাঁহার পুত্রগণের প্রকৃত সংবাদ লইবার জন্য পুরোহিত এবং কর্ম্মচারী পাঠাইলেন। রাজা পুরোহিত পাঠাইবার পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, রাজকুমারগণ অশাস্ত্রীয় ভাবে, সগোত্রে, নিতান্ত নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে বিবাহ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় কুমারগণের বিবাহ শক্য অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত হইয়াছে কি না পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহার উত্তরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলেন যে, রাজকুমারগণ যেরূপ অবস্থায় পড়িয়া ঐরূপ প্রণালীতে বিবাহ করিয়াছেন, তাহাতে উহা শক্য অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছে। রাজকুমারগণের বংশধরগণ অতঃপর শাক্য নামে পরিচিত হইলেন। ইহাই এই বংশের শাক্য নামের ইতিহাস।

রাজা সুজাতের পুত্র হস্তিশীর্ষ। এই হস্তিশীর্ষের পুত্র সিংহহনু। সিংহহনুর চারিটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মে। পুত্রগণের নাম শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন এবং অমৃতোদন ছিল। কন্যাটির নাম অমিতা।

অমিতা অসামান্য রূপবতী ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি যৌবনের পূর্ব্বেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়েন। চিকিৎসকগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ব্যাধির উপশম

করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ হতাশ হইয়া দুঃখিতান্তকরণে অমিতাকে বনে এক গুহার মধ্যে রাখিয়া আসিলেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর তাঁহার শরীর ব্যাধিহীন হইল। তিনি পুনরায় পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য পাইলেন; অমিতা কমনীয় কান্তিতে বনদেবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এমন অবস্থায় একদিন তত্রস্থ কোল নামক এক রাজর্ষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রাজর্ষি কোল মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি? অমিতার রূপলাবণ্যে তিনি মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে তাঁহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজর্ষি কোল অমিতাকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহে তাঁহাদের বহু সন্তান জন্মে। পুত্রগণ দিব্যকান্তি-বিশিষ্ট, কিন্তু সকলেরই তপস্বীর বেশ, সকলেই জটা ও অজিন শোভিত। সন্তানগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, অমিতা একদিন তাঁহাদিগকে কপিলবাস্তু নগরে তাঁহাদিগের মাতুলাশ্রমে যাইতে বলিলেন। তদনুসারে তাঁহারা সেখানে গমন করিলেন এবং আপনাদের পরিচয় দিলেন। কপিলবাস্তুতে তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া সকলে তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে অনেক ধন সম্পত্তি দিলেন।

এই প্রকারে সিংহহনুর পুত্রগণ তাঁহাদের নির্ব্বাসিতা ভগিনীর সংবাদ পাইলেন এবং ভাগিনেয়দিগের সহিত

পরিচিত হইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা অবগত হইলেন যে, তাঁহাদের ভগিনীপতি রাজর্ষি কোলের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণ দেবদেহ নগরে বাস করেন। ইহাঁদের মধ্যে তখন রাজা সুভূতি প্রধান।

পূর্ব্বে সিংহহনুর কথা বলা হইয়াছে। কালবশে তাঁহার দেহান্ত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শুদ্ধোদন রাজা হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন তদীয় ভগিনী-পতি রাজর্ষি কোলের আত্মীয় দেবদেহরাজ সুভূতির মায়া এবং মহাপ্রজাবতী নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন।

সিদ্ধার্থ-সম্ভব

রাজা শুদ্ধোদন যখন কপিলবাস্তুতে রাজত্ব করেন, তখন দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। আমাদের সময় হইতে অতীতের দিকে তাকাইয়া বর্ষগণনা করিতে গেলে, সেকাল অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, সেকালের লোকেরা অজ্ঞ এবং অসভ্য ছিলেন। সেকালের লোকেও রাজধর্ম্ম, প্রজাপালন, ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞের কথা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তখনকার সমাজেও নানা প্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল। শিক্ষিত সমাজে নানা প্রকার দার্শনিক মতভেদ ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকে মহামুনি কপিলের সাংখ্যদর্শনের দুঃখতত্ত্ব এবং তাহার প্রতিকারের উপায়ের কথা জানিতেন। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁহার বিধাতৃত্ব, আত্মার অমরত্ব, পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম, ইহকাল পরকাল, স্বর্গ নরক, যাগযজ্ঞ, পাপপুণ্য, কর্ম্মফল, পিতৃপুরুষের প্রীতির জন্য পুত্রের পিণ্ড জল, পুত্রের জন্মের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ ইত্যাদিতে, কেহই অবিশ্বাস করিতেন না। তখনকার লোকের জীবনের ক্রিয়াকর্ম্ম এই সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রাজা শুদ্ধোদন একজন আদর্শ নরপতি ছিলেন। তাঁহার অসীম পরাক্রম ছিল। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি, বাহুতে শক্তি ছিল। তিনি সতত প্রজার কল্যাণ কামনা করিতেন এবং তদর্থে প্রভূত প্রয়াস পাইতেন। এইরূপে তিনি, প্রজাগণের কল্যাণের জন্য, রাজ্যের উন্নতির জন্য, প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জীবনের সকল কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী মায়াদেবীও রাজার অনুরূপ সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি সর্ব্বকার্য্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে. তাঁহার সহকারিণী ছিলেন। সুবিশাল সুন্দর সৌধমালার ভিত্তির ন্যায়, লোকচক্ষুর অগোচরে মহিষী কার্য্য করিতেন। প্রজাসাধারণ এই-রূপ রাজদম্পতির শাসনাধীনে পরম সুখে কাল কাটাইতে-ছিল। রাজদম্পতিও আশা এবং উৎসাহের সহিত সর্ব্বপ্রকার প্রজার হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কিছুকাল এই ভাবে অতীত হইল। তাহার পর তাঁহা-দের মনে পুত্রলাভের. বাসনা প্রবল হইল। বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল, কিন্তু রাজদম্পতি পুত্র-মুখ দর্শনের সুখলাভ করিতে পারিলেন না। রাজা ও রাণীর সন্তানলাভের বয়স অতীত হইয়া যায়। আশায় সন্দেহ উপস্থিত হইল, ক্রমে সন্দেহ আশার নবীনতা নষ্ট করিয়া নৈরাশ্যের শুষ্কতা আনিতে লাগিল। রাজদম্পতি রাজধর্ম্মপালনে বিমুখ না হইলেও, তাঁহাদের সর্ব্বকার্য্যের

মধ্যে বিষণ্ণতা ও বৈরাগ্যের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। রাজ্যের আনন্দের উৎস রাজদম্পতি। তাঁহাদের মধ্যে বিষাদের বিষ মিশ্রিত হওয়াতে রাজ্যের সকল আনন্দ-স্রোতে লোকে কেমন একটা বিষাদের আস্বাদ পাইতে লাগিল। সেই বিশাল রাজ্যের সিংহাসনে কে অধিবেশন করিবে, কে তাঁহার পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ডোদক দিবে, কেই বা তাঁহাকে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত আর পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করিবে, এই চিন্তায় রাজা ব্যাকুল হইলেন। রাণীর মনের অবস্থাও তদ্রূপ। শাস্ত্রোক্ত বিবিধ যাগযজ্ঞ হইতে লাগিল।

কয়েক বৎসর এই ভাবে চলিল। কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণ এত নৈরাশ্যে পূর্ণ হইলেও, রাজ্যের প্রজাসাধারণের কল্যাণ এবং আনন্দের জন্য পূজা, পার্ব্বণ, উৎসব কিছুরই অনুষ্ঠানে ক্রটী দেখা যাইত না। প্রজাগণ পূজা পার্ব্বণের বিশেষ বিশেষ দিনে রাজার মঙ্গলকামনা করিত, তাঁহার উপযুক্ত গুণবান দীর্ঘায়ু পুত্রলাভ যাহাতে হয়, তাহার জন্য দেবস্থানে প্রার্থনা করিত।

রাজা ও রাণীর বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। জীবনের মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। আশার সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে, নিরাশার ছায়া বড় হইয়াছে, কিন্তু এমন অবস্থাতেও তাঁহারা প্রজারঞ্জনের জন্য উৎসবাদিতে যোগ দিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

প্রতি বৎসর উৎসবাদি হয়। এ বৎসরও উৎসব হইতেছে। রাজা ও রাণী উৎসবে যোগ দেওয়াতে উৎসবের আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়াছে ; প্রকৃতিও সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছে। আজ বাসন্তীপূর্ণিমা। বৃক্ষবল্লরী হরিৎ বর্ণে চারিদিক সুশোভিত করিয়াছে। মৃদুমন্দ সমীরণ উৎসবে উন্মত্ত প্রজাবৃন্দের ঘর্ম্মসিক্ত কপোল স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে পুলকিত করিতেছে। সদ্যঃপ্রস্ফু-টিত জাতী, যুথী, বেলা, মল্লিকা, শিরিস পুষ্প সকল সুগন্ধ দানে উৎসবের উন্মত্ততা বৃদ্ধি করিতেছে। মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি, বীণার ঝঙ্কার, একত্র মিলিত হইয়া সমীরণের স্নিগ্ধতার সহিত মধুরতা মিলাইয়া দিতেছে। আর গৃহ-প্রকোষ্ঠে প্রতিধ্বনি ঈর্ষ্যায় চঞ্চল হইয়া তাহার অনু-করণের চেষ্টা করিতেছে। দীপাবলী প্রকৃতি ও শিল্পের বর্ণ-লাবণ্য দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু চন্দ্রমা তাহাদের প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করিতেছে। জ্যোৎস্না ঢালিয়া তাহাদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতেছে। উৎসবের চারি-দিকেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে প্রকৃতি ও শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে। দর্শকবৃন্দ, ভাবগ্রাহিজন, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে।

রাজা ও রাণী উৎসবের দৃশ্য দেখিয়া, প্রজাবর্গের আনন্দ দেখিয়া হৃষ্টমনে প্রমোদউদ্যানে গেলেন এবং সে রাত্রি সেইখানে অবস্থান করিলেন। গভীর নিদ্রায়

মধ্যরাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। তাহার পর মায়াদেবী এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, দেবদূতগণ তাঁহাকে শয্যার উপর শায়িতা অবস্থায় গিরিশিখরে লইয়া গিয়াছেন ; সেখানে তাঁহারা তাঁহাকে স্নানাদি করাইয়া বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিতা করাইলেন। পরে পুনরায় তাঁহার জন্য এক মনোহর শয্যা রচিত হইল। রাজ্ঞী তাঁহার উপর শয়ন করিলেন। দেবদূতগণ সম্ভ্রমে দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে এক বিশাল-কায় শ্বেতহস্তী শ্বেতপদ্ম শুণ্ডে ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। হস্তী রাজ্ঞীকে বারত্রয় অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ করিয়া, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া তাঁহার গর্ব্ভে প্রবেশ করিল। এই সময় রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

রাজমহিষী আনন্দ ও বিস্ময়ে বিহ্বলচিত্ত হইয়া রাজার নিকট সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। রাজা স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ কি জানিবার জন্য অনেকগুলি দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত হইতে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগের নিকট রাজ্ঞী মায়াদেবীর স্বপ্নবৃত্তান্ত যথাযথ ভাবে বলিয়া, স্বপ্ন অলীক অথবা উহা কোন ভাবী ঘটনার সূচনা, এই প্রশ্ন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ গণনা করিয়া রাজাকে স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, রাজ্ঞীর সন্তান-সম্ভাবনা

হইয়াছে। তাঁহার গর্ভে এক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র হইবে। এই পুত্র যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকেন, তবে কালে রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন, আর যদি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন, তবে তিনি জগতের পরিত্রাতা হইবেন।

রাজা শুদ্বোদন ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিলেন। তাঁহার শুষ্কপ্রাণে অমৃতসিঞ্চন হইল। তাঁহার হতাশপ্রাণে এই আনন্দের সংবাদে যেন বিশ্বাস হইতেছিল না; তাঁহার কর্ণকে অবিশ্বাস হইতেছিল, বুঝি বা শুনিবার ভুল হইয়াছে; তাঁহার নিজ বুদ্ধিতে যেন সন্দেহ হইল, হয় ত বুঝিবার ভুল হইয়াছে। নিরাশপ্রাণে আশার বাণী আসিলে মানুষের এমনই হয়। রাজা দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধাবান ছিলেন, শাস্ত্রবাক্যে আস্থাবান ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের বাক্যে বিশ্বাস করিলেন, তাঁহার হৃদয় আশায় এবং আনন্দে পূর্ণ হইল। যথাসময়ে রাজা এই সমস্ত কথা রাণীকে বলিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রীতিপ্রফুল্ল দৃষ্টি করিলেন; দুই জনেই যেন বলিলেন, ভগবানের কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

ক্রমে দিন দিন রাজা ও রাণীর আশা এবং আনন্দ রাণীর গর্ভস্থ শিশুর সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাণী গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণ-কামনায় সর্ব্বদা সংযম এবং শুদ্ধাচারে প্রফুল্লচিত্তে সময় কাটাইতে লাগিলেন। রাজা শুদ্ধোদনও রাণীর চিত্তের প্রফুল্লতার জন্য সতত প্রয়াস পাইতে

লাগিলেন। এইভাবে মাসের পর মাস যাইতে লাগিল। রাণী পরমাসুন্দরী। তাঁহার সৌন্দর্য্য এই অবস্থায় অধিকতর হইল। তাঁহার সেই তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় যে উজ্জল বর্ণ তাহা ঈষৎ পাণ্ডুরাগরঞ্জিত হওয়াতে অধিকতর মনোজ্ঞ হইল। তাঁহাকে দেখিলেই কোন দেবীপ্রতিমা বলিয়া বোধ হইত। পতি, পত্নীর যৌবনের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন, এখন সে সৌন্দর্য্যের ভাবান্তর হইয়াছে। রূপের দীপ্তিতে স্নেহের স্নিগ্ধতা মিশ্রিত হইয়াছে। শীঘ্রই পতি পিতা, পত্নী মাতা হইবেন এই সম্ভবনায় লীলাময় বিধাতা, মাতৃশোণিতের কিয়ৎ অংশ পীযুষধারায় পরিণত করিলেন, নির্ম্মল দাম্পত্যপ্রেমের ধারাকে ত্রিধারা করিয়া স্নেহ এবং বাৎসল্যের স্রোত সৃষ্টি করিলেন। রাজা শুদ্ধোদন এবং রাণী মায়াদেবীর মনে এবং দেহে এইভাবে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। রাণী এখন আসন্নপ্রসবা। এই সময় তিনি একটী বাসনা প্রকাশ করিলেন। প্রসবের জন্য তিনি পিতৃগৃহে যাইতে চাহিলেন।

কপিলবাস্তু হইতে দেবদেহ যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত হইল। পথ ঘাটের সংস্কার হইল। পথিমধ্যে বিশ্রাম স্থান সকল ভোজ্য পানীয় এবং বিবিধ আরামদায়ক দ্রব্য সম্ভারে পূর্ণ করা হইল। সুখকর সুকোমল আসনযুক্ত যানাদির ব্যবস্থা হইল। রাণীর পিতৃগৃহ যাইবার পথে

রাজার লুম্বিনী নামক প্রমোদউদ্যান। এখানে রাণীর বিশ্রামের জন্য সকল রকমের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিশ্বস্ত পরিচারক ও পরিচারিকাগণ পূর্ব্ব হইতে সেখানে গিয়া রাণীর আগমনের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। গ্রহবিপ্র দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট শুভক্ষণে রাজ্ঞী যথাবিহিত মঙ্গলাচরণ করিয়া, রাজাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাণী সুবর্ণ শিবিকায় সুকোমল শয্যায় উপবেশন করিলেন। সুসজ্জিত বাহকগণ শিবিকা স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে গমন করিল।

অগ্রগামী প্রহরিগণ অশ্বারোহণে দ্রুতগমনে লুম্বিনীতে রাজ্ঞীর আগমন-বার্ত্তা জানাইল। উদ্যানরক্ষকগণ, কর্ম্মচারিগণ এবং দাসদাসীদিগের মধ্যে মহা ব্যস্ততা উপস্থিত হইল। রাজ্ঞীর সেবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। সকলেরই একই চিন্তা, রাণীর যাহাতে কোন অসুবিধা বা কষ্ট না হয়। রাজ্ঞীর প্রতি তাঁহাদের এমনই ভক্তি ও ভালবাসা।

সুবর্ণ শিবিকা উদ্যানমধ্যে উপস্থিত হইল। রাজ্ঞী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া অপরাহ্ণে উদ্যান দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। সেই উদ্যানবাটিকার শোভা সম্পাদন করিবার জন্য অর্থ, শ্রম ও যত্ন কিছুরই ত্রুটী ছিল না। যুথিকা, মল্লিকা

প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পুষ্পবৃক্ষবেষ্টিত মাধবীকুঞ্জ হইতে ভীমকায় শাল-তমাল-তাল-বৃক্ষশোভিত বনরাজির সেখানে অভাব ছিল না। ক্ষুদ্র সারিকা হইতে বৃহৎকায় সারসগণ সেখানে নির্ভয়ে বাস করিত। লীলাচঞ্চল চকিতনেত্র মৃগশিশু এবং গম্ভীরমূর্ত্তি কৃষ্ণসার সেখানে নির্ব্বিবাদে নির্ভয়ে বিচরণ করিত। রাজ্ঞী উদ্যানের রমণীয় শোভা সন্দর্শনে মোহিত হইয়া, একস্থান হইতে স্থানান্তরে মৃদুগমনে যাইতে লাগিলেন নাট্যশালার পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় তিনি প্রতি শতপদ অন্তরে নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। রাজ্ঞী মায়াদেবীর সুকোমল চরণদ্বয় অতি মৃদুগমনেও তাঁহার দেহের গুরুভার বহনে ক্লান্ত হইতে লাগিল, কিন্তু উদ্যানের সেই অপূর্ব্ব শোভা, তাঁহার আয়তলোচনদ্বয়কে ক্রমেই অতৃপ্ত করিতে লাগিল। রাজ্ঞী একদৃশ্য ছাড়িয়া দৃশ্যান্তরে আকৃষ্ট হইয়া তথায় গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে রৌদ্রের তেজ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। বৃক্ষগণ যেন এতক্ষণ তপনের তেজে কোমলতার প্রতিমা রাজ্ঞীকে প্রাণ ভরিয়া ছায়া দিতে পারিতেছিল না, সেই জন্য তপনের অস্তগমনের সময় উপস্থিত দেখিয়া ক্রমেই প্রাণ ভরিয়া রাজ্ঞীকে শীতল ছায়া বাড়াইয়া দিয়া সেবা করিতে লাগিল। সমীরণও সুযোগ বুঝিয়া শিকরসিক্ত হইয়া তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। এমন দেবী-প্রতিমা যেখানে

সমাগত সেখানে অন্ধকার থাকা বড় অগৌরবের কথা, তপনের প্রখর দীপ্তি অপসারিত হইবার পূর্ব্বে চন্দ্রমা স্নিগ্ধ শুভ্র রজতালোকদানে উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিল। তেজদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি তপন ও চন্দ্রমা উভয়েই যেন আজ একত্র রাজ্ঞীকে অভিবাদন করিবার জন্য পশ্চিমে ও পূর্ব্বে নত হইয়া রহিলেন। আজি প্রকৃতি কোন অভূত-পূর্ব্ব শুভ ঘটনার পূর্ব্বাভাষ পাইয়া যেন সেই লুম্বিনীর উদ্যানে একত্র হইয়াছে। যখন চারিদিক এইরূপ শোভায় পূর্ণ, তখন রাজ্ঞী বেদনা অনুভব করিলেন। তিনি বেদনা ভুলিবার জন্য যেমন একটি আনত নবপল্লব শোভিত শালশাখা ধরিতে হাতখানি তুলিবেন, এমন সময় তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।

নিমিষের মধ্যে এই শুভ সমাচার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজা শুদ্ধোদন এই শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া ত্বরিতগমনে তথায় উপস্থিত হইলেন। পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, আজ তাহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইল এবং সেই জন্য পুত্রের নাম রাখিলেন সিদ্ধার্থ।

শৈশবের শিক্ষা ও সংস্কার।

সিদ্ধার্থের জন্মের সাতদিন পরে তাঁহার মাতা রাজ্ঞী মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। রাজা শুদ্ধোদনের রাজ্যে পুত্র-জন্মোৎসবের মধ্যে বিষাদের ঘন ছায়া পতিত হইল। শরৎ-প্রসন্ন নীলাকাশে চকিতে যেমন মেঘের উদয় হইয়া রৌদ্র ও বৃষ্টিপাত যুগপৎ ঘটে, কপিলবাস্তুতে আজ তাহাই ঘটিল। হর্ষবিষাদ সেখানে একত্র উপস্থিত হইল। রাজা শুদ্ধোদন গুণবতী জায়া হারাইয়া শোকে আকুল হইলেন। তিনি তাঁহার সেই প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর গুণা-বলী স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, নির্ম্মম মৃত্যু মায়াদেবীকে লোকান্তরিত করিয়া তাঁহার কি না হরণ করিয়াছে? মায়াদেবী একাধারে তাঁহার প্রিয়া, শিষ্যা, সচিব, সখী ছিলেন! এক মায়াদেবীর অবর্ত্তমানে তিনি এ সকলেরই অভাব অনুভব করিতেছেন।

প্রবল ঝঞ্ঝাবাত আসিলে সুবিশাল বনস্পতিও ক্ষণিকের জন্য স্থৈর্য্যহীন হয়। পরে তাহা অতীত হইলে, আবার সে পূর্ব্বের ন্যায় অচল অটল ভাবে দাঁড়ায়। শুদ্ধোদনেরও সেইরূপ ঘটিল। তিনি শোকসংবরণ করিলেন। নব-প্রসূত শিশুকে পালন করিবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রজাবতীর ক্রোড়ে তাহাকে দিলেন। শিশুর সেবার জন্য বহু পরিচারিকা নিযুক্ত হইল। রাজার পুত্র সিদ্ধার্থের

কিসের অভাব ? তাঁহার লালন-পালনের জন্য, তাঁহার সুখ সুবিধার জন্য, তাঁহার আমোদ-প্রমোদের জন্য, তাঁহার ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য, ধনে জনে শ্রমে যত্নে যাহা সম্ভব তাহা সকলই করা হইল। তবে বিধাতা তাঁহাকে যে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, সে সুখ, সেই জননীর স্নেহ ও পীযুষ তিনি কোথা হইতে পাইবেন ?

সিদ্ধার্থ পিতার স্নেহযত্নে এবং সুব্যবস্থার মধ্যে দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন। ক্রমে শিশুর বয়স যখন পাঁচ বৎসর হইল তখন তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। বিশ্বামিত্র নামক একজন উপাধ্যায়ের নিকট তিনি বর্ণমালা শিক্ষা করিলেন। সিদ্ধার্থের বর্ণপরিচয় উপলক্ষে এইরূপ কথিত আছে যে, ভক্ত-প্রবর প্রহ্লাদের যেমন "ক"এ কৃষ্ণনাম মনে হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার "অ" উচ্চারণ করিবার সময় "অসার সর্ব্বসংসার" এই বাণী কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়। সে যাহা হউক, বালক সিদ্ধার্থ স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে অতি অল্প কালের মধ্যে বহু বিদ্যালাভ করিতে লাগিলেন।

বালক সিদ্ধার্থের প্রকৃতিগত অনেকগুলি বিশেষত্ব ছিল। দয়া তাহার মধ্যে প্রধান। ইহার পরিচয় সিদ্ধার্থের বাল্যে পাওয়া যায়। সামান্য ক্ষুদ্র ঘটনা দ্বারা প্রায় স্থলেই লোকের চরিত্র জানা যায়। বিশাল বায়ুমণ্ডলের গতি বৃক্ষের ক্ষুদ্র পত্রসঞ্চালনে জানিতে পারা যায়।

সিদ্ধার্থের হৃদয়ের অনন্ত দয়ার পরিচয় প্রথমে একটি আহত হংসের প্রাণ রক্ষায় প্রকাশ পায়। ক্ষত্রিয় সন্তানগণ মৃগয়াপ্রিয়। শিকার উপলক্ষে পশু-পক্ষী বধ তাঁহাদিগের পক্ষে প্রশংসার কথা। নিত্য তাঁহারা শিকারের জন্য কত পশু-পক্ষী বধ করিয়া থাকেন, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করে! বালক সিদ্ধার্থ একদিন তাঁহার সহচরগণের সহিত খেলা করিতেছিলেন। এমন সময় আকাশে অনেকগুলি হংস উড়িয়া যাইতেছিল। তাঁহার এক সহচর দেবদত্ত শিকারের এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি তীর দিয়া একটি হাঁসকে আহত করিলেন। হাঁসটি মাটিতে পড়িয়া গেল; তাহার শরীর হইতে প্রচুর রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সিদ্ধার্থ এ দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দ্রুতগমনে পাখীটির নিকট গিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া, তাহার শরীর হইতে তীরটি বাহির করিয়া দিলেন; এবং তিনি বিশেষ যত্ন করাতে পাখীটির প্রাণ রক্ষা হইল। এমন সময় দেবদত্ত হাঁসটিকে নিজের বলিয়া লইতে চাহিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ ঘাতকের হস্তে আর সেটিকে দিলেন না ঘটনাটি সামান্য হইলেও ইহা সিদ্ধার্থের হৃদয়ের গতি কোন দিকে, তাহা জানাইয়া দিয়াছিল।

এই ঘটনার পর আরও একবার একটি ঘটনা হয়। সে সময় দেখা যায় যে, অত অল্পবয়সেও সামান্য কীট

পতঙ্গের প্রতি তাঁহার কত দয়া। ঘটনাটি এই —শুদ্ধোদনের রাজ্যে নিত্য নানা উৎসব হইত। বর্ষার প্রারম্ভে হলকর্ষণের উৎসব উপস্থিত। কপিলবাস্তুর জনসাধারণ এই উৎসবের দিন নগরের বাহিরে আসিয়াছে। রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে সঙ্গে লইয়া প্রজাগণের উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছেন। ধন্য সেই দেশ, যেখানকার রাজা প্রজাগণের সহিত উৎসবে যোগ দেন! ধন্য সেই প্রজাগণ, যাহাদের রাজা তাহাদের সঙ্গে আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করেন! বাস্তবিকই কপিলবাস্তু এবং তত্রস্থ প্রজাগণ শুদ্ধোদনের রাজত্বকালে এইরূপ ধন্য ছিল। নগরের সৌধরাজি এবং প্রমোদকাননের সীমানার বাহিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে—যেখানে বসুন্ধরা নিদাঘে মরুপ্রায় মরীচিকাপূর্ণ, প্রাবৃটে দেববর্ষণে সুস্নিগ্ধ শস্যশ্যামলা, হেমন্তে সুবর্ণবর্ণ রঞ্জিত হয়—সেই বিশাল ক্ষেত্রসমূহে কৃষকগণ হলচালনার জন্য উপস্থিত। সকলেই রাজার এবং রাজকুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনি আসিয়া আজ্ঞা দিলেই হলচালনা আরম্ভ হইবে। ক্রমে রাজা সিদ্ধার্থকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার আদেশে কৃষকগণ বসুধা বিদীর্ণ করিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে হল চালনা করিতে লাগিল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ অনিমিষ নেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি দেখিলেন, ক্ষেত্র সকল সেইরূপে

কর্ষিত এবং মথিত হওয়াতে কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ সকল আশ্রয়স্থানচ্যুত হইয়া সে স্থানটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আকাশে পক্ষিগণ তাহাদের লোভে উড়িতেছে। একে অপরের প্রাণ সংহার করিতেছে।

এই সকল জীবের ক্লেশ এবং মৃত্যু দেখিয়া রাজকুমারের হৃদয় দুঃখপূর্ণ হইল। তিনি উৎসবের আনন্দের কথা ভুলিয়া গেলেন। তিনি পরে পিতাকে মনের ভাব জানাইলেন এবং সেই উৎসব বন্ধ করিতে বলিলেন।

সিদ্ধার্থের শৈশবের এই দুটি ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁহার সমবয়স্ক বালকগণের ন্যায় আমোদপ্রিয় ছিলেন না। বালকোচিত ক্রীড়া কৌতুকে রত হইলেও তিনি যেন কেমন অন্যমনস্ক থাকিতেন। তাঁহার আয়ত লোচন দুটি যেন সদাই সকরুণ ও আদ্র্র থাকিত, মুখমণ্ডল যেন কোন অজ্ঞাত চিন্তায় আকুল দেখাইত। রাজকুমার সিদ্ধার্থ এইরূপ হৃদয়-মনের ভাব লইয়া শৈশব হইতে বাল্য, ক্রমে বাল্য হইতে কৈশোর বয়সে পদার্পণ করিলেন।

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের এই ভাব দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইতে লাগিলেন এবং কি উপায়ে পুত্রকে সর্ব্বদা হর্ষোৎফুল্ল রাখিতে পারা যায়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

যৌবন ও বিবাহ।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ এখন যুবরাজ। পিতার সুব্যবস্থায়, নিজের বুদ্ধিমত্তা, চেষ্টা এবং যত্নের গুণে, সদ্‌গুরুর উপদেশে সিদ্ধার্থ সেই বয়সেই সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। রাজা শুদ্ধোদন তাঁহাকে দেখিলেই মনে মনে ভাবিতেন, কবে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন। আশার কুহকে, কল্পনায় সিদ্ধার্থকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার সুখ তাঁহার মনের মধ্যে বিদ্যুতের মত দীপ্ত হইয়া ক্ষণিকে তাহা অন্ধকারে পরিণত হইত। পুত্র সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেও তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব, সর্ব্ববিষয়ব্যাপার হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার আন্তরিক প্রয়াস, তাঁহার করুণোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, দয়ার্দ্র নয়নযুগল, সর্ব্বদাই শুদ্ধোদনকে দৈবজ্ঞ পণ্ডিতগণের ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ করাইয়া দিত।

রাজা দশরথ যখন অপুত্রক ছিলেন তখন তিনি পুত্রশোক পাইবেন এই অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন সেই সময় আসিয়াছিল, তখন তিনি কতই না কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন! পুত্রশোক যাহাতে না পাইতে হয় তাহার জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছিলেন! রাজা শুদ্ধোদনের প্রায় সেইরূপ মনের ভাব হইয়াছিল। মায়াদেবীর সন্তানসম্ভাবনার

সংবাদ এবং সেই সঙ্গে গর্ভস্থ সন্তানের সন্ন্যাসগ্রহণের কথা শুনিয়া, ভবিষ্যতের দুঃখ উপেক্ষা করিয়া, তিনি বর্ত্তমানের সুখই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কালস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া, রাজা এখন বর্ত্তমানকে অতীতের তীরে রাখিয়া, সেই তথাকথিত ভবিষ্যতের তীরভূমি দেখিতে লাগিলেন। তথাকার দৃশ্যের পরিচয় যতই স্পষ্টতর দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তরে আতঙ্কের উদয় হইতে লাগিল। একদিন উৎসবক্ষেত্রের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে, সিদ্ধার্থকে একান্তে একটি জম্বুবৃক্ষতলে ঘোর চিন্তামগ্ন দেখিয়া রাজা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধার্থ এতই চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন যে, তিনি একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। উৎসবের আনন্দ-কোলাহল, বিশাল জনসঙ্ঘের গমনাগমন কিছুই তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে পারে নাই দেখিয়া, লোকে আশ্চর্য্য হইয়াছিল, কিন্তু রাজা তাহা দেখিয়া প্রমাদ গণিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে পিতা পুত্রকে অন্যপথে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যাহাতে পুত্র প্রমোদে মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন, আমোদ-আহ্লাদে, নৃত্য-গীতে, ক্রীড়া-কৌতুকে দিন রাত্রি মগ্ন থাকেন তাহার জন্য নানা উপায় স্থির হইল। বৃদ্ধ রাজা, মুক্ত আকাশ-চারী কলকণ্ঠ সুন্দর বিহঙ্গকে আত্মতৃপ্তির জন্য সুবর্ণ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তিনি

ভাবিতেছেন, বিহঙ্গ সেই সুবর্ণপিঞ্জরে থাকিয়া, রাজসেবা ভোগ করিয়া মুক্ত জ্যোতির্ম্ময় নির্ম্মল অনন্ত আকাশ ভ্রমণের সুখের কথা ভুলিবে। হায় মোহান্ধ মানব! শুনিতে পাই যিনি আত্মবৎ সর্ব্বভূতে দেখেন তিনি পণ্ডিত ; হইতে পারেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যের এই সংজ্ঞা বড়ই সঙ্কীর্ণ। মানবের বুঝা উচিত—সকলের মত, সকলের রুচি, সকলের প্রবৃত্তি এক নহে। মানবপ্রকৃতির এই গূঢ় রহস্যটুকু বুঝিয়া, প্রত্যেকের মত, রুচি, প্রবৃত্তি-প্রবণতা বুঝিয়া, যদি আমরা আমাদের লোক-ব্যবহার নিয়মিত করিতাম, তবে পৃথিবীতে কত ভালবাসার ও স্নেহের অত্যাচার, ভক্তিশ্রদ্ধার উপদ্রব কম হইত, তাহা কে বলিতে পারে ?

রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের চিত্তবিনোদনের জন্য নূতন প্রাসাদ এবং নূতন প্রমোদকাননের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কপিলবাস্তু নগরীর পাদদেশ ধৌত করিয়া নির্ম্মলসলিলা রোহিণী প্রবাহিত হইতেছে। অদূরে গিরিরাজ শোভা পাইতেছে। সূর্য্যালোকে পর্ব্বতশিখরের তুষারের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শোভা বড় মনোরম। পর্ব্বতগাত্রের পাষাণের কঠোরতা বনরাজির হরিৎবর্ণ লুকাইয়া রাখিয়াছে। এই নিসর্গশোভনা সুন্দর স্থানে কুমারের বাসোপযোগী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। প্রাসাদের চারিদিকে বহুদূরবিস্তৃত প্রমোদ-

উদ্যান রচিত হইল। সৌধের প্রকোষ্ঠগুলি সুসজ্জিত হইল। জনপদের কোলাহল, জনসাধারণের রোগ, শোক, কাতরতার কোন চিহ্ন তাহার ত্রিসীমানায় যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইল।

অতঃপর রাজা সিদ্ধার্থের শুভপরিণয়ের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে কুমারের মত জিজ্ঞাসা করা হইল। কুমার সপ্তাহকাল পরে উত্তর দিবেন বলিলেন। সিদ্ধার্থ এই উপলক্ষে সকল কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা, বংশের গৌরব, রাজ্যের কল্যাণ, প্রজার হিত এক দিকে, আর তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের প্রবণতা দয়াধর্ম্মের প্রেরণা, জীবের মুক্তি, জগতের কল্যাণ অপর দিকে, সিদ্ধার্থের বিবেচ্য বিষয় হইল। তিনি সকল দিক বিশেষ ভাবে বিচার করিলেন। তিনি দেখিলেন, জগতের আদর্শ হইতে হইলে পূর্ণাদর্শ হওয়া আবশ্যক। বিবাহ না করিলে মানবের জীবন অসম্পূর্ণ থাকে। মানবের কতকগুলি পবিত্র ভাব এবং বৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। জগতকে নিজ জীবনদ্বারা যিনি শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার চিরকুমার থাকা উচিত নহে। তাহাতে পূর্ণমনুষ্যত্বের আদর্শ ম্লান হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া সিদ্ধার্থ সপ্তাহান্তে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন— তিনি বিবাহ করিবেন।

পিতা পুত্রের অভিমত জানিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার মোহের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইল। রাজা শুদ্ধোদন কুমারের মনোমত পাত্রী অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিলেন। অমাত্য, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত সকলে সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্তা কন্যার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। প্রকাশ্যে রাজকুমারের উপযুক্ত বিশেষ বিশেষ সুলক্ষণসংযুক্তা কন্যার জন্য ঘোষণা করা হইল। রাজকুমার স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন করিবেন।

একটি শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজপ্রাসাদের একটি প্রশস্ত মনোরম কক্ষে স্থান নির্দ্দেশ করা হইল। তথায় বহুসংখ্যক অশোকভাণ্ড পুষ্পপত্রে সজ্জিত হইল। প্রত্যেক ভাণ্ডের মধ্যে ধনরত্ন দেওয়া হইল। পরে সেই সুন্দর সজ্জিত অশোকভাণ্ডগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া একস্থানে রাখা হইল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিমন্ত্রিত কুমারীগণ উদ্যানে সমবেত হইয়াছেন। কুমারীগণ বিবিধ মনোরম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তথায় আসিয়াছেন। কিশোরীগণের রূপের ছটায়, অলঙ্কারের ঘটায়, বসনের বর্ণবৈচিত্রে, সেই কাম্যকাননের কুসুমরাজি আজ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সলাজ সরল দৃষ্টিতে হরিণী চঞ্চল হইয়া তাঁহাদের সঙ্গত্যাগ করিয়া দূরে যাইতেছে। ময়ূর ময়ূরী তাঁহাদের বসনের বর্ণচ্ছটা দেখিয়া পুচ্ছবিস্তার করিয়া নাচিতেছে না। কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণ

কিশোরীগণের সুমধুর স্বর, ভূষণের সিঞ্জন, নূপুরের নিক্কণ শুনিয়া আর তাঁহাদের রূপ দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। কখন কখন তাহারা পক্ষ সঞ্চালন করিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন, তাহারা কিশোরীগণের রূপলাবণ্য ও সুমধুর স্বর শুনিয়া ঈর্ষায় স্ফীতকলেবর হইয়া পক্ষ সঞ্চালন করিতেছে। আজ প্রজাপতির উৎসবে আসিয়া কিশোরীগণ প্রজাপতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। তাঁহারা কুসুম হইতে কুসুমান্তরে গিয়া তাহাদের সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্যের তুলনায় কোনটির প্রতি অনুরাগ, কোনটির প্রতি বিরাগ দেখাইতেছেন। কিশোরীগণ যখন এইরূপ তুলনায় কুসুমের রূপগুণের বিচার করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা ভাবেন নাই যে, অল্পক্ষণ পরেই একজন—এই ভাবে তুলনায় তাঁহাদের বিচার করিবেন।

গোলমালে, আগ্রহে, ঔৎসুক্যে সময় কাটিয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। সিদ্ধার্থ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। ক্রমে একটি একটি কিশোরী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। যুবরাজ সিদ্ধার্থ প্রত্যেককে সহাস্য বদনে একটি একটি সুন্দর সুশোভন অশোকভাণ্ড দিতে লাগিলেন। কিশোরী করপল্লব দুখানি প্রসারিত করিয়া যুবরাজের উপহার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া তথা হইতে চলিয়া বাহিরে আসিলেন। এইভাবে অনেকগুলি কুমারী চলিয়া

গেলেন। শেষে একটি কিশোরী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কন্যাটি সলজ্জ ভাবে যখন রাজকুমারকে অভিবাদন করিলেন, তখন সেই দৃষ্টি বিদ্যুৎগতিতে যুবরাজের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্থিরচিত্তকে চঞ্চল করিল। অতঃপর যুবরাজের চঞ্চলচিত্ত তাঁহার নয়নদ্বয়কে অধিকতর মনোজ্ঞ করিল। কিশোরীর চকোর নয়নে তাঁহার সেই দৃষ্টি প্রতিভাত হওয়াতে কিশোরী যেন কিছু না জানিয়া না বুঝিয়া অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। আজ রাজকুমারের হৃদয়াকাশের ঘন ঘটা দূর করিয়া জ্যোতির্ম্ময় নয়নের দীপ্তিতে তাঁহার সম্মুখস্থ একখানি ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে ইন্দ্রধনুর উদয় হইল। কিন্তু কন্দর্প সেখানিকে নিজের পুষ্পধনু করিলেন। অশোক-উৎসবের উদ্দেশ্য সাধিত হইল।

যুবরাজ ক্ষণিকের মধ্যে চিত্তসংযত করিলেন। পরে যথারীতি উৎসব সমাপ্ত হইল। ক্রমে সকল সংবাদ রাজা শুদ্ধোদনের কর্ণগোচর হইল।

রাজা শুদ্ধোদন কন্যা যশোধরার পিতা দণ্ডপাণির নিকট পুরোহিত পাঠাইলেন। দণ্ডপাণি সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। কিন্তু তিনি শুদ্ধোদনের রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া, তাঁহার পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি যুবরাজের শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় না পাইলে, রাজার

প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারেন না—এই কথা পুরোহিতকে বলিয়া দিলেন। পুরোহিত রাজসমীপে যথাযথ সকল কথাই জানাইলেন। শুদ্ধোদন যেন একটু বিমর্ষ হইলেন। যাহা হউক ক্রমে একথা সিদ্ধার্থের নিকট পঁহুছিল। তিনি আপনার শৌয্য, বীর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে সম্মত হইলেন। বৃদ্ধ রাজার হৃদয় হইতে আশঙ্কার একখানা কাল মেঘ সরিয়া গেল। আশার আলোক সেখানে দেখা গেল।

রাজা দণ্ডপাণিকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, ক্ষত্রিয়ের সন্তান কে কবে শৌর্য্য, বীর্য্য দেখাইবার অবসর ত্যাগ করিয়া থাকে? প্রকাশ্য সভামধ্যে, সাধুসজ্জন শূর-বীরগণের সমক্ষে তাঁহার পুত্র সিদ্ধার্থ শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিবেন। তিনি যেন উপযুক্ত আয়োজন করেন। এই সংবাদ পাইয়া শুভদিনে সমস্ত আয়োজন করা হইল। রাজা শুদ্ধোদন মহাসমারোহে সিদ্ধার্থকে লইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। যুবরাজ ধনুর্বিদ্যা, অসিচালনা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি বীর জনোচিত রণপাণ্ডিত্যের এবং বেদ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত-ছন্দ কল্প, সাংখ্য, যোগ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে স্বীয় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া সভাস্থ সকলকে বিস্মিত করিলেন। দণ্ডপাণির মনের দ্বিধা ঘুচিয়া গেল। সিদ্ধার্থ কন্দর্পের পুষ্পধনুকে পরাস্ত করিয়া আজ

স্বয়ং নিজের ধনুর সাহায্যে বীরজায়া লাভ করিলেন। সিদ্ধার্থ এবং যশোধরার শুভ পরিণয় সমাপন হইল। প্রকৃতি পুরুষের মিলন হইল। মানব জগতের আদর্শ উজ্জ্বলতর হইল।

নব দম্পতী।

রাজা বর-বধূ লইয়া কপিলবাস্তুতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানী কয়েক দিবস বিবাহের উৎসবে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নগরে আনন্দের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সর্ব্বত্র দাও, খাও, শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। নাগরিকগণের সৌধে, দরিদ্রের কুটীরে, আনন্দ ও অন্নবস্ত্রের অভাব দেখা গেল না। ক্রমে আনন্দের উচ্ছ্বাস সমতা পাইল। আনন্দের নদীতে শ্রাবণের প্লাবন স্থগিত হইল—এখন তাহা ভাদ্রের ভরা ভাব ধরিল।

সিদ্ধার্থের চিত্তবিনোদনের জন্য বিনোদভবন পূর্ব্ব হইতে সজ্জিত ছিল। নবদম্পতী তথায় গমন করিলেন। বৃদ্ধ রাজার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তাঁহার চিন্তার ভার লঘু হইল। আশঙ্কার স্থলে আশার আলো দেখা যাইতে লাগিল। অতঃপর নবদম্পতীর চিত্তরঞ্জনের জন্য, তাঁহাদের উভয়ের প্রেমের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য, মায়া ও মোহের আবরণ ঘন করিবার জন্য, রাজা সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন। ভোগবিলাসের জন্য কিছুরই অভাব রহিল না। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সহিত নবদম্পতী আবাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতেন। প্রকৃতি যে ঋতুতে যে বস্তুটিকে, যে দৃশ্যকে, দুর্ল্লভ করিয়া, ভোগলালসা বৃদ্ধি করে, শিল্পকলা, রাজভবনে সেই বস্তুটিকে, সেই দৃশ্যকে সুলভ করিয়া নব-

দম্পতীর বিলাস-লালসা তৃপ্ত করিত। নিদাঘের দিনে শীকরসিক্ত মৃদুমন্দ সমীরণ, সুশীতল ছায়া, লতাপল্লবের হরিৎশোভা, সুস্নিগ্ধ পানীয় সেই গ্রীষ্মাবাসে প্রচুর ছিল। নিদাঘের নিশীথে, জ্যোৎস্নাপুলকিত; উৎসশোভিত, শ্যামলদূর্ব্বাদলশোভান্বিত উদ্যান ভূমিতে তাঁহারা পাদ-চারণা করিতেন।

প্রাবৃটকালে যখন আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইত, ময়ূর ময়ূরীগণ যখন সেই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া নাচিত, মেঘ-গর্জ্জনের সহিত যখন তাহাদের কেকাধ্বনি মিলাইয়া যাইত, যখন ঘন ঘন বিদ্যুৎবিকাশে, প্রকৃতির বিষণ্ণতা ক্ষণিকের জন্য অপসারিত হইত, ময়ূরের বিস্তৃত পুচ্ছ অপূর্ব্ব বর্ণ-গৌরব লাভ করিত, আর সেই বিদ্যুতালোকে নববধূর মুখমণ্ডল, নয়নযুগল বিস্ময়বিস্ফারিত হইত, মণিময় কুণ্ডল উজ্জ্বলতর হইত, তখন যুবরাজ সিদ্ধার্থ ভাবাবেশপূর্ণ হইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতেন।

শরতকালে আকাশ যখন প্রসন্ন হয়, প্রকৃতির বিষণ্ণতা যখন দূরে যায়, নদী সরোবর, হ্রদতড়াগে সলিল যখন স্বচ্ছ হইয়া, কমল কুমুদ কহ্লারে সুশোভিত হয়, এবং হংস কারণ্ডবের কলরবে মুখরিত হয়, তখন প্রকৃতির সেই প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিবার জন্য তাঁহারা সৌধান্তরে গিয়া বাস করিতেন।

পরে হেমন্ত এবং শীতঋতু সমাগত হইলে তৎকালোপ-

যোগী সুরম্য হর্ম্মে তাঁহারা বাস করিতেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে যে তরুণ তপনের কিরণ গবাক্ষদ্বার দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না এখন কালবশে তাহাই প্রীতিকর হইয়াছে। উত্তাপের জন্য গৃহমধ্যে সমস্ত রাত্রি বহ্নিসেবার আয়োজন করা হইত। যে সুশীতল বায়ু কিছুকাল পূর্ব্বে এত প্রিয় ছিল এখন কালবশে তাহার ভাগ্যবিপর্য্যয় হইয়াছে। এখন গৃহমধ্যে তাহার প্রবেশ নিষেধ। পাছে আলোকের সহিত সে গৃহমধ্যে প্রবেশ লাভ করে, এই আশঙ্কায় বুদ্ধিমান শিল্পী গৃহদ্বার সকল স্ফটিক দ্বারা বন্ধ করিয়াছে। নিদাঘের নিশিথে যে সুপ্রশস্ত হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া চন্দ্রমাশোভিত নীলাকাশ, জ্যোৎস্নাপুলকিত ধরণী, মৃদুমন্দ অনিলচঞ্চল বিটপী লতার শ্যাম শোভা, সমীরণসঞ্চালিত পেলব পত্র-পুষ্প-সুগন্ধি উপভোগ করিবার জন্য বাসনা হইত এখন কালবশে, তাহাদের কথা মনে হইতেছে না। এখন প্রাসাদের প্রকোষ্ঠ সকল আনন্দনিলয় হইয়াছে। নবদম্পতী হেমন্ত এবং শীত কাল এইভাবে অতিবাহন করিতেন।

ঋতুরাজ বসন্ত সমাগত হইলে সিদ্ধার্থ সস্ত্রীক প্রমোদকাননে গিয়া বাস করিতেন। এখন প্রকৃতির সে দৈন্যদশা আর নাই। ঊষা অতি প্রত্যুষেই দিনমণি তরুণ তপনের আগমন ঘোষণা করিতেছে। বৃক্ষরাজির নূতন নূতন পত্রে প্রাতঃসূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ পতিত হইয়া প্রকৃতি অপূর্ব্ব

শোভা ধারণ করিতেছে। শীতের জড়তা বা অবসাদের চিহ্ন আর নাই। দারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপের সে বিভীষিকাও আর দেখা যায় না। বাতাস ফুলের সুবাস, এবং ঈষৎ উষ্ণতা লইয়া প্রাণীগণের নিকট সুখের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতি এবং প্রাণীজগৎ আনন্দপূর্ণ। তরুলতা পত্রপুষ্পে সুশোভিত, পক্ষিগণের সুস্বরে সর্ব্বত্র মুখরিত, বাতাস কুসুমসুবাসপূর্ণ। প্রকৃতির সেই আনন্দ-নিলয়ে নবদম্পতী একবৃন্তের দুইটি সদ্যপ্রস্ফুট ফুলের ন্যায় প্রমোদ কাননে শোভা পাইতে লাগিলেন।

শুভ পরিণয়ের পর হইতে, তাঁহারা ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত, প্রতিবৎসর, পর্য্যায়ক্রমে এক ভবন হইতে ভবনান্তরে বাস করিতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ সর্ব্বগুণের আধার ছিলেন। যশোধরা তাঁহার অনুরূপ ভার্য্যা হইয়াছিলেন। পুষ্পের সুবাসের ন্যায়, চন্দ্রের কিরণের ন্যায়, আলোকের দীপ্তির ন্যায়, তিনি অনুক্ষণ সিদ্ধার্থের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। সিদ্ধার্থের প্রেম ও সুশিক্ষার গুণে যশোধরা এখন তাঁহার ঃ—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যাঃ ললিতেকলাবিধৌ।

রাজা পুত্র ও পুত্রবধূকে এইভাবে পরস্পর অনুরক্ত দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। দণ্ডপাণি-গৃহিণী কন্যা যশোধরা পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী হইয়াছেন দেখিয়া আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিলেন।

নবীন দম্পতীর প্রেমের সরোবর এখন পরিপূর্ণ। সিদ্ধার্থ ও যশোধরা রাজহংস এবং রাজহংসীর ন্যায় তথায় সতত বিচরণ করেন। প্রেমে যখন তাঁহারা আত্মহারা হয়েন তখন সে সরোবর প্রশান্ত মূর্ত্তিতে টল্‌টল্‌ করে। প্রেম বৈচিত্র্যে যখন উভয়ের মধ্যে অভিমান আসে তখন সে সরোবর বীচিবিক্ষুব্ধ হয়, এবং সেই প্রেম সরোবরে তরঙ্গায়িত সাগরবক্ষে চন্দ্র ও রোহিণীর প্রতিবিম্বের ন্যায়, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেন। সেই নির্ম্মল সরোবরে প্রেম বৈচিত্র্যের প্রত্যেক ভাবের নব নব লীলা তাঁহারা নিত্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়। কাল-সমুদ্রে সেগুলি যেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনাজনিত ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ উঠাইয়া একে অপরের পিছনে চলিয়া যায়।

সিদ্ধার্থ এবং যশোধরার শুভপরিণয়ের পর এইভাবে বহুবর্ষ, দিন যামিনী, শিশির বসন্ত, কতবার আসিল, গেল। কেহ তাঁহার গণনা করিল না। কিন্তু ক্রমে গণনার দিন নিকট হইতে লাগিল।

নিত্য কত শত ঘটনা ঘটিতেছে কে তাহা মনে করিয়া রাখে? যে ঘটনাটি মনে লাগে, প্রাণে সুখ দুঃখ অথবা অতীতের কোন স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, সেই ঘটনাটি লোকে মনে রাখে—যে দিন তাহা ঘটে সেই দিনটি মনে রাখে।

সিদ্ধার্থের জীবনে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিল। সেইজন্য, সেই ঘটনাটির উল্লেখ করিতেছি।

রাত্রি প্রভাত হইল। আবার সূর্য্য উঠিল। লোকে পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন বলিয়া দিনের পরিমাণ গণনা করিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের নির্দ্দিষ্ট কাজ সমাপন হইল। যুবরাজের প্রীতি ও প্রফুল্লতার জন্য যে দিনের যাহা, যে সময়ের যাহা তাহার আয়োজন হইল; যথ্যকালে তাহার সমাপন হইল। চন্দ্র সূর্য্যের আবর্ত্তনের ন্যায় অবাধে সে সকল চলিতে লাগিল। কবি ও শিল্পী কল্পনার এবং ললিতকলার সাহায্যে ভোগে এবং দৃশ্যে, যাহা কিছু সম্ভব সেই সকল নব নব মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া, সিদ্ধার্থও যশোধরাকে সতত প্রফুল্ল করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। দরিদ্রজন মনে করে রাজভোগে,রাজ-ভবনে সকলই নূতন, সকলই মনোরম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। কিছুদিনের পর সকল জিনিসের নূতনত্ব চলিয়া যায়। মোহের আবরণ খুলিয়া যায়। তখন সকলই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বলিয়া বোধ হয়। পৌনপুনিক দশমিক রাশির ন্যায় সেই সকল তথাকথিত নূতন আমোদপ্রমোদ, ভোগসুখ কেবল পুনরাবর্ত্তন করে মাত্র। তাহাদের দৈর্ঘ্যও যত বড় হয় মূল্যও তত কম্ হয়।

যাক্। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজিও গায়িকাগণ প্রভাতী গাহিল।

ঊষার আলোকের সহিত রাজপুত্রের সুখনিদ্রা সুখে ভঙ্গ করিবার জন্য গায়িকাগণ ললিতরাগে আজি গাহিতে লাগিল ঃ—

“জরা ব্যাধি দুঃখে ভরা হায় ! এই ত্রিভুবন,
মরণ অগ্নিতে দীপ্ত, অনাশ্রয় অকিঞ্চন।
কুম্ভগত ভ্রমরের মত হায় ! জীব আর
মরণের হস্ত হ'তে নাহি উদ্ধার তার ?
শারদীয় অভ্রসম অনিত্য এ রঙ্গালয়,
জন্ম মৃত্যু নিরন্তর করিতেছে অভিনয়।
বেগবতী নদী মত চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রায়,
মানব জীবন দ্রুত কোথায় চলিয়া যায়।
অজ্ঞান আধারে ঘোর তৃষ্ণায় পীড়িত নর,
কুম্ভকার-চক্রমত ঘুরিতেছে নিরন্তর।
ইন্দ্রিয়ের সুখে মুগ্ধ হায় রে মানব যত,
জড়িত ব্যাধির জালে প্রলুব্ধ মৃগের মত।
বাসনাই জ্বলন্ত বহ্নি, তাহার ইন্ধন ভোগ ;
ভোগসুখ স্বপ্নসম, জলে চন্দ্রছায়া যোগ।
যৌবনে সুন্দর দেহ, হ'লে জরা ব্যাধিগত,
করে নর পরিহার মৃগে শুষ্ক হ্রদমত।
ফলিত পুষ্পিত চারুবৃক্ষসম দেহ হায় !
জরা আক্রমিলে হায় তড়িৎ আহত প্রায়।

কহ মুনে, মানবের কি আছে উপায় বল ?
জরা দহে দেহ, যথা গুপ্তবিষ বনস্থল।
হবে পরাক্রম বেগ, সুরূপ বিরূপ করে,
হরে সুখ হরে শান্তি, ব্যাধিদগ্ধ করে নরে।
কহ মুনে মানবের কি আছে উপায় বল ?
নির্ব্বাণ হইবে কিসে জরা ব্যাধি দুঃখানল।
শিশিরে তুষারপাতে প্রফুল্ল কমল প্রায়,
হায় দেহ বলরূপ—সকলি শুকায়ে যায়।
নিপতিত নদীবক্ষে বিশুষ্ক পত্রের মত,
এ সংসারে প্রিয়জন ভাসিয়া যায় সতত।
যে যায় সে যায় হায়! কেহ ত ফিরেনা আর,
মিলন তাহার সহ নাহি হয় আর বার।
সকলি মৃত্যুর বশে মৃত্যু বল বশে কার ?
জন্মজরা মরণের বিষে পূর্ণ এ সংসার
করেছিলে প্রণিধান সিদ্ধার্থ ? কি মনে হয়
উদ্ধারিতে এ সংসার ? উপস্থিত সে সময়।”

সিদ্ধার্থের নিদ্রাভঙ্গ হইল। গাথা শেষ হইল। কিন্তু গাথার সে সুরে সিদ্ধার্থের মন উদাস হইল। তাঁহার মনে কত অতীত স্মৃতি জাগরিত হইল। তিনি পূর্ব্বাপর কত কি ভাবিলেন, তিনি ভাবিলেন

প্রমোদে ঢালি দিনু মন
তবু কেন প্রাণ কাঁদেরে ?

বৈরাগ্যের সূচনা।

সিদ্ধার্থের চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সত্য-বাদী কর্ত্তব্যপরায়ণ সুস্থকায় যুবককে তাহার অপূর্ণ আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে সে যেমন ব্যাকুল হয়, কেন সে তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দেশ্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, কিসের জন্য সে সমস্ত ভুলিয়া আছে, তাহা সে যেমন ভাবিতে আরম্ভ করে, সিদ্ধার্থও সেইরূপে, সেইভাবে, সে সকল কথা ভাবিতে লাগিলেন। এখন তিনি থাকিয়া থাকিয়া অন্যমনস্ক হয়েন। তাঁহার সম্মুখে কোন বিষয়ের আলোচনা হইলে, অনেকক্ষণ পরে, তিনি এখন মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন "অ্যাঁ তারপর তোমরা কি বলিতেছিলে?" গৃহের সাজসজ্জা, উদ্যানের শোভা, নর্ত্তকীর নৃত্যগীত, প্রিয়জনের কথাপ্রসঙ্গ কিছুই আর তাঁহার দৃষ্টি বা শ্রুতিকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে না।

সিদ্ধার্থের এই ভাব পরিবর্ত্তন যশোধরা লক্ষ্য করিলেন। কোন্ প্রিয়তমা সতী স্ত্রী তাঁহার স্বামীর মনের প্রত্যেক ভাবাবেগ না লক্ষ্য করেন? যশোধরাও তাহাই করিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রাণের কথা জানিতেন। এখন সেই সকল ভাবের লক্ষণ দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। যশোধরা সকল কথা জানিলেও

তাঁহার মনে সন্দেহ হইল হয় ত তাঁহার পতির সেবায় কোন ত্রুটী হইয়া থাকিবে—হয় ত অজ্ঞাতসারে তিনি প্রিয়তমের কোন অপ্রিয় কাজ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি অতি সঙ্কোচের সহিত, অতি কাতরতার সহিত, অবসর বুঝিয়া সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাসা করিতেন, নাথ, আমি কোন ত্রুটী অপরাধ করিনাই ত? তোমার আহারে রুচি নাই, ক্রীড়ায় অনুরাগ নাই, নিদ্রায় গভীরতা নাই, মুখে প্রসন্নতা নাই, চক্ষে সে প্রেমোজ্জল দীপ্তি নাই; ইহার কারণ কি? আমার ভয় হয়, আমার ত্রুটী অপরাধের, অযোগ্যতার জন্যই এইরূপ ঘটিতেছে। তখন সিদ্ধার্থ চকিতের ন্যায়, কেন? কেন? প্রিয়তমে, কেন এমন কথা বলিতেছ? বলিয়া যশোধরার বিস্ফারিত নয়নযুগল, রক্তিমাভ গণ্ডদ্বয় এবং কপোল চুম্বন করিতেন। যশোধরা তখন আশ্বস্ত হইয়া অন্য কথাপ্রসঙ্গ উপস্থিত করিতেন।

সিদ্ধার্থের এই পরিবর্ত্তনের কথা ক্রমে রাজা শুনিলেন। এতদিন তিনি এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। কেবল পুত্রকে রাজ্যভার দিবার জন্য তিনি শুভ অবসরের অপেক্ষা করিতে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইবার নহে। তিনি সিদ্ধার্থের বৈরাগের ভাবের কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইলেন।

সিদ্ধার্থ সুশিক্ষিত, বিবিধ শাস্ত্রদর্শী ও চিন্তাশীল

ছিলেন। তাঁহার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার প্রশ্নের প্রত্যেকটির মীমাংসা করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা যত বাড়িতে লাগিল তাঁহার সন্দেহও তত বেশী হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি সকল বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহার কিছুই ভাল লাগেনা। "অব সব বিষময় লাগয়ে মোহি।"

এখন সিদ্ধার্থের প্রমোদ কাননে থাকিতে আর ভাল লাগেনা। তিনি লোকসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে চাহেন। নগরের বাহিরে ভ্রমণ করিতে যাইবার জন্য তিনি বড়ই ব্যগ্র। প্রাকার পরিখা বেষ্টিত নগরী,রুদ্ধবায়ু, কৃত্রিম দৃশ্য, কপট আচরণ আর তাঁহার ভাল লাগে না। প্রশস্ত প্রান্তর, সুনীল গগন, মুক্তবায়ু, দিগন্ত ব্যাপী দৃশ্য, নীরব নিস্তব্ধ প্রদেশ, এখন তাঁহাকে বড় ভাল লাগে। এখন তিনি প্রায়ই সায়াহ্নে রথযোগে নগরের বাহিরে ভ্রমণের জন্য যান। একদিন তিনি এইরূপে ভ্রমণের জন্য নগরের বাহিরে যাইবার একটি পথ দিয়া যাইতেছেন; যাইতে যাইতে, একটি দৃশ্য তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

হে সারথে, এই ব্যক্তি যষ্ঠী ধরিয়া অতিকষ্টে স্খলিত পদে যাইতেছে কেন? ইহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, স্থির হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই। দেহের রক্ত মাংস চর্ম্ম

সকলই শুকাইয়া গিয়াছে. দেহের শিরা সকল দেখা যাইতেছে। ইহার মস্তকের কেশ শুভ্র হইয়াছে, দন্ত অল্প হইয়াছে, হস্তপদাদি নিতান্ত কৃশ। ইহার কারণ কি তুমি জান ?"

সারথি ইহার উত্তরে নিবেদন করিলেন :—

হে প্রভো, এই লোকটি জরাগ্রস্ত। সেই জন্য এই ব্যক্তি এত কাতর এবং দুঃখিত। ইহার এখন বল বীর্য্য নাই। ইহার ইন্দ্রিয়গণ ক্ষীণ হইয়াছে। আত্মীয় বন্ধুগণ ইহাকে পরিত্যাগ করাতে এই লোকটি অনাথ হইয়াছে। বনস্থিত জীর্ণ কাষ্ঠের ন্যায় এই ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া কালাতিপাত করিতেছে।

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র সারথিকে আবার প্রশ্ন করিলেন :—

এই ব্যক্তি কি ইহার কুলধর্ম্ম অনুসারে জরা গ্রস্থ হইয়াছে, না, পৃথিবীর সকল লোকেরই এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে ? তুমি শীঘ্র ইহার প্রকৃত উত্তর দাও, তোমার উত্তর শুনিলে আমি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিব।

তদুত্তরে সারথি বলিলেন :—

হে দেব, এই জরা এব্যক্তি কুলধর্ম্ম অথবা রাজ্যের নিয়ম অনুসারে প্রাপ্তহয় নাই। সংসারে সকল লোক সময়ে যৌবন এবং জরা প্রাপ্ত হয়। আপনি

আপনার মাতা পিতা বন্ধু এবং জ্ঞাতিবর্গ কেহই জরার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন না। লোকের অন্যগতি নাই।

সারথির কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ বলিলেন ঃ—

হে সারথে, লোকের এই বালজনোচিত্ত বুদ্ধিকে ধিক! ইহা জরাকে না দেখিয়া যৌবনে মত্ত হয়। তুমি রথ ফিরাও। আমি আবাঁর ঐ জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিব। জরা যখন অনিবার্য্য, তখন কি আমার আমোদ প্রমোদ ভাল লাগে?

এই একদিনের ঘটনা। আর এক দিন আর একটি ঘটনা উপস্থিত। সে দিন সিদ্ধার্থ নগরের দক্ষিণ পথে যাইতে ছিলেন। পথি মধ্যে একজন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া তাহার বিষয় জানিবার জন্য সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

হে সারথে, এই লোকটির গাত্র বিবর্ণ কেন? এই ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল বিকল, লোকটি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছে, ইহার সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক; আপনার বিষ্টা মূত্রের মধ্যে থাকিয়া এ ব্যক্তি অতি কষ্টে কাল কাটাইতেছে। ইহার কারণ কি বল?

সারথি উত্তর করিলেন ঃ—

হে দেব, এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে।

আরোগ্য লাভের সম্ভবনা নাই, মৃত্যু আসন্ন, বলশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এইব্যক্তি এখন আশ্রয়হীন।

সারথির কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ বলিলেন ঃ—

দেখ, আরোগ্য স্বপ্নক্রীড়ার মত অলীক। ব্যাধি সকলের এইরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমোদ আহ্লাদে রত থাকিতে পারেন অথবা জগতে যে শুভ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন ?

আর একদিনের কথা। রাজপুত্র নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া ভ্রমণ করিতে যাইতেছেন। পথি মধ্যে একটি শব-দেহ তিনি দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

হে সারথে, এই লোকটিকে মঞ্চের উপরে রাখিয়া কেন লইয়া যাইতেছে ? ইহার চারিদিকের লোকগুলিই বা নখ চুল কাঁপাইয়া মাথায় ধূলি দিতেছে আর বক্ষেই বা করাঘাত করিয়া কাতর বচনে বিলাপ করিতেছে কেন বল !

তখন সারথি বলিলেন ঃ—

হে দেব, জম্বুদ্বীপে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। এই ব্যক্তি পুনরায় মাতা পিতা পুত্র স্ত্রীকে দেখিতে পাইবে না ; গৃহ মাতা, পিতা জ্ঞাতিবন্ধু প্রভৃতি সকল ত্যাগ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। এ ব্যক্তি পুনরায় জ্ঞাতিবর্গকে দেখিতে পাইবে না।

ইহা শুনিয়া সিদ্ধার্থ বলিলেন ঃ—

জরা দ্রুতগতিতে যৌবনের অনুগমন করে, অতএব যৌবনকে ধিক ! বিবিধ ব্যাধি আরোগ্যকে পরাহত করে, অতএব আরোগ্যকে ধিক ! জীবন চিরস্থায়ী নহে, অতএব জীবনকে ধিক ! আর সেই পণ্ডিত পুরুষকে ধিক, যিনি আমোদ প্রমোদে রত থাকেন। যদি জরা ব্যাধি মৃত্যু না থাকিত তাঁহা হইলেও লোককে পঞ্চস্কন্ধ ধারণ হেতু মহাদুঃখ ভোগ করিতে হইত। এইরূপ স্থলে জরা ব্যাধি ও মৃত্যু যখন আমাদের নিত্য সহচর তখন আমরা যে দুঃখ ভোগ করি তাহা আর বিচিত্র কি ? হে সারথে, তুমি গৃহে ফিরিয়া চল, আমি দুঃখ বিমোচনের উপায় চিন্তা করিব।

সিদ্ধার্থ এই সকল দৃশ্য দেখিয়া জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যুর কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহার বৈরাগ্য ততই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার মনের অবস্থা যখন এইরূপ তখন তিনি এক দিন নগরের উত্তর পথ দিয়া ভ্রমণে যাইতেছিলেন। সে পথে তিনি একজন সাধু সন্ন্যাসীকে দেখিলেন, তিনি ইঁহার বিষয় জানিবার জন্য সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

হে সারথে, এই যে গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া গমন করিতেছেন ইনি কে ?

ইনি প্রশান্তচিত্ত, স্থিরদৃষ্টি, ইনি উন্নতও নহেন এবং অবনতও নহেন ইহার বিষয় কি জান বল।

সারথি বলিলেনঃ—

হে দেব, এই পুরুষ ভিক্ষু। ইনি কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহার আচার ব্যবহার সুবিনীত। ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আত্মার সমতা অন্বেষণ করিতেছেন এবং হিংসাবিদ্বেষ শূন্য হইয়া দীন ভাবে আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছেন।

ইহা শুনিয়া সিদ্ধার্থ কহিলেনঃ—

হে সারথে,তুমি যাহা বলিলে তাহা অতি উত্তম। উহা আমার মনের মত। পণ্ডিতগণ চিরকাল সন্ন্যাসাশ্রমের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ঐ আশ্রমে থাকিয়া লোক আপনার এবং পরের মঙ্গল সাধন করিতে পারে। ঐ আশ্রমের ফল অমৃত।

সিদ্ধার্থ এত দিনে স্পষ্ট করিয়া আপনার অভিপ্রায় বলিলেন। কোন্ সুমধুর অমৃত ফল তাঁহার রুচিকর তাহা তিনি ব্যক্ত করিলেন। রাজা শুদ্ধোদনের কর্ণে এ সংবাদ অচিরে পহুছিল। তিনি প্রমাদ গণিলেন।

সিদ্ধার্থবিদায়।

যুবরাজ সুশিক্ষিত। নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত। তাঁহার হৃদয় ভাবপ্রবণ হইলেও তিনি যুক্তিবিচার কখনও উপেক্ষা করেন নাই। দয়া এবং প্রেমে তাঁহার হৃদয় প্রাণ পূর্ণ হইলেও তিনি কখনও তাহাদের প্রেরণায় অন্ধের ন্যায়, ভাবোন্মত্তের ন্যায়, কোন কার্য্য করেন নাই। তিনি বিবাহ করিয়া, গৃহস্থাশ্রমের সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি সকলদিক বিচার করিয়া আত্ম এবং পরহিত সাধনার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিবার জন্য স্থির সঙ্কল্প করিয়াছেন। যখন তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন সেই সময় তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল।

পুত্রের জন্মের সংবাদ যথাসময়ে সিদ্ধার্থের নিকট পহুছিল। তিনি এই সংবাদ পাইয়া ভাবিলেন, আর না, মায়ার বন্ধন ক্রমেই দৃঢ়তর হইবে। অতএব আর বিলম্ব করা উচিত নহে। কিন্তু গৃহত্যাগের পূর্ব্বে স্নেহশীল বৃদ্ধ পিতার নিকট, প্রেমময়ী পতিপ্রাণা ভার্য্যা যশোধরার নিকট বিদায় লওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া সিদ্ধার্থ রাজপুরীর মধ্যে অসিলেন। এই সময় সদ্যঃজাত শিশুর জাতকর্ম্মোপলক্ষে বিবিধ আনন্দোৎসব হইতেছিল।

সিদ্ধার্থের চিত্ত সেদিকে আকৃষ্ট হইল না, তিনি পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

স্নেহশীল বৃদ্ধ রাজা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। পিতা পুত্রের মিলন হইল। মোহান্ধ পিতা পূর্ব্বেই পুত্রের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছিলেন। পুত্রের মুখ দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় ভাবাবেশে পুর্ণ হইল; তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইল, নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। যাহা হউক কোনরূপে আত্মসংবরণ করিয়া শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে আপনার নিকট বসাইলেন। পিতাপুত্রে কথোপকথন আরম্ভ হইল। সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন বলিয়া পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন বলিলেন। শুদ্ধোদন পুত্রকে তাঁহার কর্ত্তব্য কি তাহা যথাশক্তি বুঝাইতে লাগিলেন। রাজা, কখন বংশের, রাজ্যের গৌরব ও হিতের কথা, কখন স্নেহ ও প্রেমের বন্ধনের কথা, কখনও সিদ্ধার্থের অবর্ত্তমানে, বৃদ্ধ পিতা, যুবতী পতিপ্রাণা পত্নী যশোধরা, শিশু পুত্রের কি দশা হইবে তাহার কথা বিবেচনা করিতে বলিতে লাগিলেন। কখনও রাজা শাস্ত্রযুক্তির কথা উত্থাপন করিয়া পুত্রকে তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বলিতে লাগিলেন।

সিদ্ধার্থ পিতার সকল কথার সকল যুক্তির উত্তর সসম্ভ্রমে দিতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষের মোহ অন্ধকার

সহজে ঘুচে না। স্বার্থ, সুখ, স্নেহ মমতা, যুক্তি বিচারকে দূরে রাখিয়া লোকে আপন আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। শুদ্ধোধন রাজা হইলেও মানব। তিনি সকল কথা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না। রাজা মনের আবেগে বলিলেন বৎস, পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যাহার জন্য তুমি গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাও? আমার রাজ-শক্তিদ্বারা কোন বস্তু না সংগ্রহ করা যাইতে পারে? তুমি যাহা পাইলে সুখী হও, সংসারধর্ম্মে থাকিতে চাও, বল, আমি আমার সর্ব্বস্ব বিনিময়ে তাহা তোমার জন্য সংগ্রহ করিয়া দিব।

রাজা তাঁহার সমস্ত বক্তব্য শেষ করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সিদ্ধার্থ বিনয়বচনে পিতাকে বলিলেন, আমি জরা ব্যধি এবং মৃত্যুর অতীত হইতে চাহি। আমি চিরযৌবন চাহি। জরা যেন তাহাকে নাশ না করে। পীড়া যেন আমাকে কদাপি ক্লেশ না দেয়, আর মৃত্যু যেন আমাকে গ্রাস না করে। আমার এই চারিটি প্রার্থনা পূর্ণ হইলে আমি সংসার আশ্রমে থাকিতে আপত্তি করিব না। শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের প্রার্থনা পূর্ণ করা যে অসম্ভব তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি সে কথা তাঁহাকে বলিলেন। সিদ্ধার্থ পিতার মনের অবস্থা বুঝিয়া তখন তাঁহার স্বীয় উদ্দেশ্যের কথা বলিলেন। সে কালে দেশে হোম ও যজ্ঞই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল।

এই সকল যজ্ঞে নিত্য অসংখ্য পশুবলি হইত। ধর্ম্মের এই গ্লানিকর হিংসাপ্রধান কর্ম্ম বন্ধ করা যে সিদ্ধার্থের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম তাহাও তিনি পিতাকে জানাই-লেন। তাহার পর মানুষকে অনন্ত দুঃখের হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য কোন বিহিত উপায় আছে কিনা তাহা অন্বেষণ করিবেন, একথাও তিনি পিতাকে বলিলেন। সংসার আশ্রমে থাকিয়া রাজধর্ম্ম যথাবিহিত ভাবে পালন করিতে হইলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেনা। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সন্ন্যাস গ্রহণই শ্রেয়। এই রূপে সমস্ত কথা বিশদ ভাবে পিতাকে বুঝাইয়া দিলে পর, তিনি পুত্রকে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। সিদ্ধার্থ পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পিতার শয়নাগার হইতে সিদ্ধার্থ বাহির হইলেন। রাজপুরী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার প্রিয়তমা যশোধরা এবং নবজাত পুত্রকে দেখিবার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইল। তিনি যশোধরার কক্ষের দিকে চলিলেন।

রাজপুরী তখন নিস্তব্ধ হইয়াছে। উৎসবের নৃত্য-গীত থামিয়া গিয়াছে। দীপালোক ম্লান হইয়াছে। যশোধরার কক্ষের সম্মুখস্থ নৃত্য মণ্ডপের সজ্জা শিথিল হইয়াছে। চন্দ্রাতপের স্তম্ভলগ্ন পুষ্পপত্রের মাল্যের গ্রন্থি শিথিল ও স্থানচ্যুত হইয়াছে। চন্দ্রাতপ তলে নর্ত্তকীগণ

আলুথালু বেশে যে যেখানে পড়িয়াছে সে সেখানেই ঘুমাইতেছে। এখন আর কাহারও বসন ভূষণের পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি নাই। কটির বসন শিথিল হইয়া গিয়াছে, অঙ্গের ভূষণ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে, গণ্ডের রক্তরাগ বিকৃত হইয়াছে, কপালের তিলক মুছিয়া গিয়াছে, কবরী শিথিল হইয়া গিয়াছে, বেণী পৃষ্ঠ হইতে স্থানচ্যুত হইয়া কণ্ঠে আসিয়া রত্নমালাকে আবৃত করিয়াছে। তাহাদের কুটিল কটাক্ষে আর সে তেজ নাই, হাস্যের আর সে লহরী নাই, চঞ্চলচরণের আর সে রঙ্গ লীলা নাই, করপল্লবে আর সে আন্দোলন নাই, কোন অঙ্গে আর ভঙ্গিমা নাই। সকলেই নিস্তব্ধ, নীরব, নিশ্চল। মাঝে মাঝে স্বপ্নাবেশে কাহার কাহারও মুখাকৃতি বিকট হইতেছে; কাহারও নাসাধ্বনি হইতেছে। সিদ্ধার্থ এই দৃশ্য দেখিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার ভাবুক মনে কত চিন্তার লহরী উঠিল। বাহ্য দৃশ্যের অসারতা, কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের বিফলতা যেন তিনি স্পষ্টতর ভাবে উপলব্ধি করিলেন। আসক্তির প্রতি তাঁহার ঘৃণা যেন আরও বেশী হইল। মোহময় সংসার হইতে দূরে যাইবার জন্য যেন তাঁহার প্রাণ আরও ব্যাকুল হইল। যাহা হউক, হৃদয়ের সমস্ত ভাবকে সংযত করিয়া তিনি যশোধরার কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, যশোধরা বামহস্তের উপর মাথাদিয়া নবজাত পুত্রকে বক্ষে সংলগ্ন

করিয়া শুইয়া আছেন। নিদ্রায় অচেতন। সম্মুখে প্রাণপতি সিদ্ধার্থ উপস্থিত। তাঁহাকে শেষবার দেখিবার জন্য আসিয়াছেন তাহাও তিনি জানেন না। আহা জানিলে এ চিত্র অন্য রূপ হইত! সিদ্ধার্থ একবার দুই বার তিনবার দেখিলেন আবার দেখিলেন; মনে করিলেন একবার পুত্রকে ক্রোড়ে লই, জগতের সকল স্পর্শ সুখের শ্রেষ্ঠ, পুত্রের শির স্পর্শ সুখ ভোগ করেন। কিন্তু পরক্ষণে সে বাসনা ত্যাগ করিলেন। পুত্রকে ক্রোড়ে লইলে পাছে যশোধরা জাগিয়া উঠেন তাহা হইলে তাহার যাত্রা ভঙ্গ হইবে এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে কোলে লইতে পারিলেন না। সিদ্ধার্থ আবার দেখিলেন - শিশুপুত্র যশোধরার অঙ্কশোভা করিয়া রহিয়াছে। সিদ্ধার্থ মনে মনে তাহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাদের অলক্ষিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহত্যাগ।

সিদ্ধার্থ রাজঅন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিলেন। সেখানে আসিয়া ছন্দককে ডাকিলেন। ছন্দক অশ্বপাল, রথ অশ্বাদি তিনি রক্ষা করেন। রাজপুত্রের আহ্বান শুনিবা মাত্র ছন্দক অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ ছন্দককে নিজ অভিপ্রায় বলিলেন এবং তাঁহার প্রিয় অশ্ব কণ্টককে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। শরৎ কালের আকাশ ক্ষণিকে প্রসন্ন ক্ষণিকে মেঘাচ্ছন্ন হয়। লোকে ইহা জানিলেও তখন মেঘগর্জ্জন হইলে চকিত ও স্তম্ভিত হয়; যুবরাজের মতিগতি সকলে পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন তথাপি আজ তাঁহার মুখে সেই নিদারুণ কথা শুনিয়া ছন্দক চকিত স্তম্ভিত এবং ক্ষুব্ধ হইলেন। ছন্দক "যে আজ্ঞা" বলিয়াই পরক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া করযোড়ে বিনয় বচনে সিদ্ধার্থকে কিছু নিবেদন করিবেন এইরূপ ভাব জানাইলেন। সিদ্ধার্থ অনুমতি দিলেন। ছন্দক বলিলেন তিনি শাক্যরাজের পুরাতন ভৃত্য। তিনি সতত রাজ-বংশের কুশল কামনা করেন। যুবরাজ গৃহত্যাগ করিয়া যাইলে রাজ্যের রাজকুলের সমূহ অমঙ্গল হইবে, বৃদ্ধপিতা তাঁহার শোকে দেহত্যাগ করিবেন যুবরাজ-পত্নী

যৌবনে যোগিনী হইবেন, শিশুপুত্র পিতৃহীন অনাথ হইবে, রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, প্রজাকুল রক্ষক হীন হইবে। তাঁহার বৃদ্ধপিতা, যুবতী ভার্য্যা, শিশু পুত্র, হিতকারী আত্মীয়গণ, অনুগত সেবাপরায়ণ ভৃত্য ও অনুচরবর্গ, রাজভক্ত প্রজাসকল তাঁহার ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, সৌহার্দ্দ্য, দয়া এবং বাৎসল্যের অনুপযুক্ত নহে। ইহাদের প্রত্যেকের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য আছে। অতএব যুবরাজ ইহাদের কথা আর একবার বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন। ছন্দক তাঁহাকে ভোগ সুখের কথা বলিলেন। তিনি যশোধরার অলোকসামান্য রূপ লাবণ্যের কথা, তাঁহার পতিভক্তির কথা, নবজাত কুমারের সুলক্ষণের কথা উল্লেখ করিলেন। এসমস্ত কথাই সিদ্ধার্থ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন এবং সেগুলির ভালমন্দ দুইদিক বিচার করিয়াছিলেন। সুতরাং ছন্দককে বুঝাইতে, প্রবোধদিতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না। তিনি ছন্দককে স্নেহভরে আবেগপূর্ণ ভাষায় দৃঢ়তার সহিত সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন।

রাজকুমার বলিলেন, ছন্দক, তোমার অনুরাগ দেখিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। তুমি যাহা যাহা বলিলে সে সমস্তই আমি বহুদিন হইতে বিবেচনা করিয়া আসিতেছি আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, এবং শব্দজনিত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সকল সুখই উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে আমার

তৃপ্তি হয় নাই। আমি গৃহত্যাগ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি। কুঠারাঘাত কর, শরনিক্ষেপ কর, প্রস্তরাঘাত কর, প্রজ্বলিত লৌহদণ্ড ধারণ করিয়া বাধা দাও অশনিসম্পাত হউক, অথবা প্রদীপ্ত শৈল শিখর সম্মুখে সমুপস্থিত হউক কিছুই আমার গতিরোধ করিতে পারিবে না—কিছুই আমাকে আর গৃহাভিমুখে লইয়া যাইতে পারিবে না। ছন্দক প্রবীণ, লোকচরিত্র ভালই বুঝিতেন। সিদ্ধার্থের কণ্ঠস্বরে তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্খার তীব্রতা এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি নিতান্ত দুঃখিত মনে যুবরাজের আজ্ঞাপালন করিলেন, অশ্ববর কণ্টককে সজ্জিত করিয়া সিদ্ধার্থের সম্মুখে আনিলেন। পুষ্যানক্ষত্রে, রাত্রির দ্বিতীয় যামে সিদ্ধার্থ অশ্বারোহণে গৃহত্যাগ করিলেন। ছন্দক তাঁহার অনুগমন করিলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণ।

সিদ্ধার্থ দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই রাত্রিতেই কপিলাবস্তু হইতে অনেক দূরে আসিয়া পহুছিলেন। অনমা নদীতীরে এক আম্রকাননে যখন তিনি উপস্থিত হইলেন তখন রাত্রি প্রভাত হইল। এই স্থান শাক্যনগরী হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে ৪৫ ক্রোশ দূরে। রাজার আদেশে নগরী হইতে তাঁহার অন্বেষণে যাহারা প্রেরিত হইয়াছে শীঘ্র তাহাদের এখানে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সিদ্ধার্থ সেই নদীতীরবর্ত্তী আম্রকাননে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। ছন্দক তাহার অনুগমন করিতে ছিলেন। তিনি সেই খানে নামিলেন। সিদ্ধার্থ এইস্থানে আপন ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম তরবারি দ্বারা কটিয়া ফেলিলেন ও অঙ্গের আভরণ খুলিয়া ছন্দককে দিলেন। নিকটে এক ব্যাধ যাইতেছিল রাজপুত্র ব্যাধকে ডাকিয়া নিজের সুচিক্কণ পরিধেয় তাহাকে দিলেন এবং তাহার চীরখণ্ড স্বয়ং পরিধান করিলেন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তত্ত্বান্বেষী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছন্দককে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত রত্নাভরণ এবং অশ্ববর কণ্টককে রাজপুরীতে লইয়া যাইতে বলিলেন। ছন্দক রাজপুত্রের সেই বেশ দেখিয়া শোকসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বালকের ন্যায় দুই হস্তে মুখ আবৃত

করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্বচিৎ তাঁহার মুখ হইতে দুই একটি কথা শুনা যাইতেছিল। সিদ্ধার্থ সংযতচিত্ত হইলেও ছন্দকের কাতর ক্রন্দনে, পরিত্যক্ত পরিজন-বর্গের স্মৃতিতে ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হইলেন। প্রাবৃটের ঘনঘটা বর্ষণের পূর্ব্বে যখন গম্ভীর ভাব ধারণ করে তখন তাহাকে বড়ই কঠোর বলিয়া বোধহয়, সে বক্ষে বজ্র ধারণ করে। কিন্তু সেই মেঘে যখন শীতল বায়ু স্পর্শ হয় তখন সে বারি ধারা বর্ষণ করে। সিদ্ধার্থের হৃদয়াকাশের অবস্থা আজ ইহারই অনুরূপ। যিনি ভীমগর্জ্জনে দেশের ও সমাজের হিংসামূলক ক্রিয়া কাণ্ড রহিত করিবার জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ, যিনি প্রেমের পীযুষ ধারাবর্ষণে জনসমাজকে প্লাবিত করিতে উদ্যত হইয়া সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিয়া গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তিনি আজ ছন্দকের করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া অশ্রুপাত করিলেন। আহা উহা ত অশ্রু নহে! উহা যে সিদ্ধার্থের বিশ্বজনীন প্রেমের ধারার সুচনা মাত্র। ছন্দক আকুল হৃদয়ে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে রাজকুমারের মুখের দিকে যতই তাকাইতে যান, তাঁহার অন্তরের ভাব ততই উদ্বেলিত হইয়া চক্ষুকে অশ্রুপূর্ণ করে। ছন্দক দেখিলেন রাজপুত্রের পাদদেশে বড় বড় বারিবিন্দু পড়িতেছে। তিনি মনে করিলেন বুঝিবা এগুলি বারিবিন্দু নহে, রাজকুমারের হৃদয়ে স্নেহ মমতা কোথায় যে তিনি অশ্রুপাত করিবেন?

হয়ত এগুলি তাঁহার ছিন্ন মুক্তা হারের অবশিষ্ট মুক্তা-ফলক! ছন্দক আবার অশ্রুসংবরণ করিয়া দেখিলেন কুমারের নয়নদ্বয় বাষ্পাকুল। সিদ্ধার্থ ছন্দককে বিদায় দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরের দিকে চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তিনি শাক্যা এবং পদ্মা নাম্নী দুইজন ব্রাহ্মণ পত্নীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরে তিনি ব্রহ্মর্ষি রৈবতের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মর্ষি সাদরে অতিথি সৎকার করিলেন। এইস্থানে সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরবাসী আরাড়কালাম নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতের প্রশংসা শ্রবণ করেন। আরাড়কালামের অসামান্য পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ কিছুদিনের জন্য তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ক্রমে তিনি আরাড়কালামের সমীপে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় তাঁহাকে জানাইলেন আরাড়কালাম সিদ্ধার্থের অনন্যসাধারণ রূপ-লাবণ্য দেখিয়া, তাঁহার কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সাদরে তাঁহাকে আশ্রমে স্থান দিলেন। আরাড়কালামের বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল। তিনি দর্শন এবং যোগশাস্ত্র শিখাইতেন। তাঁহার মতে লোকে বিষয় বাসনা রহিত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। সিদ্ধার্থ কিছুকাল তাঁহার উপদেশ শুনিলেন, তাঁহার নির্দ্দেশমত যোগাভ্যাস করিলেন কিন্তু শেষে এই

গুরু প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং ধ্যান ধারণা করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সিদ্ধার্থ আরাড়কালামের আশ্রম ত্যাগ করিয়া মগধে গমন করিলেন।

রাজগৃহ তখন মগধের রাজধানী। বিম্বিসার মগধের রাজা। একদিন সিদ্ধার্থ রাজগৃহে ভিক্ষার্থে বাহির হইয়াছেন। নগরের লোকে সিদ্ধার্থকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাঁহার তেজোদীপ্ত কান্তি দেখিয়া লোকে তিনি দেব কি মানব ঠিক করিতে পারিল না। ক্রমে এই যোগীপুরুষের কথা রাজসমীপে পহুছিল। রাজা বিম্বসার কৌতুহলাবিষ্ট হইলেন। তিনি মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য পাত্রমিত্র আমাত্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। গৃহী এবং সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হইল। রাজা, সন্ন্যাসীকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া বলিলেন," হে মহাভাগ, আমি অদ্য আপনার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে রাজ্যশাসনে সহায়তা করুন ; আমি আপনাকে রাজ্যভার দিতেছি, আপনি এখানে বাঞ্ছিত সকল সুখভোগ করুন।

মগধরাজ বিম্বিসারের এতাদৃশ সাদর আহ্বানের উত্তরে সিদ্ধার্থ কহিলেন, হে রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক। আমি কোনও সুখের বাঞ্ছা করি না। বাসনা বিষতুল্য এবং নানা অমঙ্গলের হেতু। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা

সর্ব্বদা উহার নিন্দা করিয়াছেন। আমি অখাদ্যের ন্যায় কামনাকে ত্যাগ করিয়াছি। এইরূপ কথপোকথনের পর রাজা বিম্বিসার সিদ্ধার্থের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি যথাযথ আত্ম-পরিচয় দিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মগধরাজ বলিলেন হে দেব, যদি আপনি সাধনায় সিদ্ধ লাভ করেন, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েন তবে আমি ভবদীয় ধর্ম্মের শরণ লইব। এই বলিয়া তিনি সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় লইয়া নিজ রাজধানীতে আসলেন।

বৈশালীর দার্শনিক পণ্ডিতের শিক্ষা ও উপদেশ সিদ্ধার্থের মনঃপূত না হওয়াতে সিদ্ধার্থ অপর একজন সদগুরুর অন্বেষণ করিতেছিলেন। রাজগৃহের নিকটে অবস্থানকালে তিনি রুদ্রক নামক একজন পণ্ডিতের কথা শুনিতে পান। ইঁহার দার্শনিক মত অন্যরূপ ছিল। তিনি বলিতেন যাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি সমাধি এবং প্রজ্ঞা এই পাঁচটির সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহাদের সাহায্যে মুক্তিলাভ হইলে লোকে জ্ঞান এবং অজ্ঞান এই দুইটিকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবেন। সিদ্ধার্থ রুদ্রকের নিকট কিছুকাল উপদেশ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু রুদ্রকের শিক্ষা ও উপদেশে সিদ্ধার্থ নিজের ঈপ্সিত পথ দেখিতে পাইলেন না। তিনি রুদ্রকের আশ্রম ত্যাগ করিয়া গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এইখানে নির্জ্জনে তিনি অনেক দিন ধরিয়া

ধ্যান ধারণা করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মের অনেক গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে লাগিলেন।

যখন সিদ্ধার্থ এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন তখন তাঁহার মনে কামনা এবং দিব্যজ্ঞানের কথা উদয় হয়। তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া এই স্থির করিলেন যে মানুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুর বশবর্ত্তী থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। অতঃপর তিনি এবিষয়ে আরও গূঢ়তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ দিব্যজ্ঞান পাইবার জন্য নানা স্থানে নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রার্থিত বস্তুর সাক্ষাৎ লাভ হইল না। তিনি চিন্তাকুল হৃদয়ে রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই পথে গমন করিতে করিতে এক দিন উরুবিল্ব গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র জনপদের পাদদেশ ধৌত করিয়া নিরঞ্জনা নদী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। তিনি নদীতীরে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। স্রোতস্বতী নিরঞ্জনার শীকরসিক্ত বাতাস মৃদু হিল্লোলে বহিয়া যাইতেছে। সেই সুখস্পর্শ বায়ু সেবনে শ্রান্ত সন্ন্যাসী প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহার পথ শ্রান্তি দূরে গেল। ছায়া প্রধান বৃক্ষের মূলে বসিয়া তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। স্থানটি অতি

মনোরম বোধ হইল। সম্মুখে পর্ব্বত দুহিতা নিরঞ্জনা পল্লী বালিকার ন্যায় লীলা চঞ্চল গতিতে বহিয়া যাইতেছে। হংস কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণ কলরব করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। বৃক্ষ শাখায় হরিৎ পত্র মধ্যে কোকিল, চাতক, পাপিয়া প্রভৃতি কলকণ্ঠ বিহগগণ গান করিতেছে। পার্শ্বস্থ বনস্থলী হইতে অযত্নসঞ্জাত বনফুলের গন্ধ চারিদিক আমোদিত করিতেছে। সিদ্ধার্থ সংযত ইন্দ্রিয় হইলেও, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়-সুখ ভোগকে তুচ্ছ করিলেও, আজ প্রকৃতি প্রদত্ত বনস্থলী-রূপ ডালি তিনি গ্রহণ করিলেন এবং বোধ হইল যেন অজ্ঞাতসারে তাহা উপভোগ করিলেন; যদি তিনি তাহা না করিতেন তবে তাঁহার চিত্তের সেই প্রসন্নতা কোথা হইতে আসিল আর সেই রম্য বনস্থলীর জন্য কেনই বা তাঁহার অনুরাগ জন্মিল? সিদ্ধার্থ প্রকৃতি দেবীর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি এই স্থানটিকে তাঁহার সাধনভূমি করিলেন।

যোগসাধনা।

বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যখন সিদ্ধার্থ দেখিলেন শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহার ঈপ্সিত বস্তু নাই তখন একদিন কাষ্ঠ সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদনের কথা মনে হইল। তিনি ভাবিলেন দুইখণ্ড আর্দ্রকাষ্ঠে অগ্নি উৎপন্ন হইতে পারে না। কাষ্ঠ শুষ্ক না হইলে উহা সম্ভবপর নহে। তিনি মানবদেহ ও মনকে কাষ্ঠের ন্যায় বিবেচনা করিলেন এবং ভোগ বিষয়াসক্তি প্রভৃতিকে জলের ন্যায় জ্ঞান করিলেন। ভোগস্পৃহা বিষয়ানুরাগ দেহ ও মনের আর্দ্রতা আনয়ন করে। এবং তজ্জন্য তাহাদের সংঘর্ষণে অগ্নি অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অতএব দিব্যজ্ঞান, পরমজ্যোতি লাভ করিতে হইলে দেহ এবং মনকে শুষ্ক করিতে হইবে। দেহকে কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা ক্লিষ্ট করিতে হইবে, মনকে বৈরাগ্য দ্বারা বিকারশূন্য করিতে হইবে। যখন সিদ্ধার্থ উরুবিল্বে নিরঞ্জনা তীরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন এই উপমা ঘটিত চিন্তাই তাঁহার মনে প্রবল হইয়াছিল। এই চিন্তার দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে যোগাভ্যাস করা আবশ্যক।

সিদ্ধার্থ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তথায় যোগাসনে বসিলেন। প্রথমে তিনি যোগশাস্ত্র প্রশংসিত আস্ফানক নামক যোগ আরম্ভ করিলেন। তিনি শ্বাস প্রশ্বাস

রুদ্ধ করিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই সকল যোগের প্রক্রিয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। রুদ্ধবায়ু শরীরের মধ্যে থাকিয়া দেহকে কষ্ট দেয়। সিদ্ধার্থ সে সকল দৈহিক ক্লেশকে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা সংযত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সিদ্ধার্থের সঙ্গে পাঁচজন শিষ্য বাস করিতেন। তাঁহারা যোগীবরের আদেশ অনুসারে পান আহার সংগ্রহ করিয়া দিতেন। ক্রমে তাঁহার পান আহার অল্প হইতে অল্পতর হইতে লাগিল। শেষে তিনি কোনদিন একটি আমলকী, কোনদিন একটি বদরী কোনদিন বা একটি তণ্ডুল মাত্র আহার করিতেন এবং কচিত গণ্ডুষ মাত্র জল পান করিতেন। পান আহার সম্বন্ধে ত এইরূপ ব্যবস্থা। শীতাতপ নিবারণ করিবার জন্য তাঁহার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। অনাবৃত গাত্রে, বৈশাখের রৌদ্র, শ্রাবণের ধারা, কার্ত্তিকের হিম, মাঘের শীত তিনি সকলই সহ্য করিতেন। সুদীর্ঘ ষড়বর্ষ এইভাবে কৃচ্ছ্র সাধনায় কাটিয়া গেল। দেহ অস্থিসার হইল। কপিলবাস্তুর রাজপরিবারের কেহ যদি সিদ্ধার্থকে এই সময়ে দেখিতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই রাজপুত্রকে চিনিতে পারিতেন না। রাজপুত্রের আর সে নধর দেহ নাই—তাঁহার কায়ার ছায়ামাত্র আছে। দেহের সে দিব্যকান্তি নাই—শুষ্ক ত্বকাবৃত অস্থিমাত্র আছে। নয়নের সে জ্যোতি নাই, মস্তকে সে কুঞ্চিত কৃষ্ণ

কেশদাম নাই, তাহা জটাজুটে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি, তখনও তাঁহার উৎকট সাধনার বিরাম নাই।

ষড়বর্ষের শেষে একদিন তাঁহার যোগভঙ্গ হইল। তিনি বুঝিলেন যে দেহপাত করিয়াও ত ঈপ্সিত সত্যবস্তু পাইলেন না। তখন তাঁহার চিত্ত কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইল। সে প্রশান্ত চিত্তে দুই চারিটি চিন্তার লহরী উঠিল। চিন্তা করিতে করিতে সিদ্ধার্থের মনে হইল যেন স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র একটি ত্রিতন্ত্রী বীণা বাদন করিতে করিতে আকাশ পথে বিচরণ করিতেছেন। তিনি মানসচক্ষে দেখিলেন সেই বীণার একটি তার অতি শিথিলভাবে সংলগ্ন করা হইয়াছে অপরটি অতিশয় কঠোরভাবে সংযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু মধ্যের তন্ত্রীটিকে যথাযথভাবে যোজনা করা হইয়াছে। দেবরাজের অঙ্গুলিস্পর্শে প্রথম এবং তৃতীয় তারে অস্পষ্ট ধ্বনি হইতেছে কিন্তু মধ্যতন্ত্রী হইতে সুন্দর স্বরলহরী উঠিতেছে।

সিদ্ধার্থ এই কাল্পনিক দৃশ্যের অর্থবিচার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মনে হইল, মানবের জীবনের সহিত এই বীণার তুলনা করা যাইতে পারে। জীবনের তার শিথিল-ভাবে বাঁধিলে, অসংযতভাবে, ভোগ বিলাসে জীবন অতিবাহন করিলে, তাহাতে প্রকৃত স্বরগ্রাম বাজিবে

না। অথবা, উৎকট সাধনার দ্বারা শরীরকে নিগ্রহ করিলে, জীবনের তন্ত্রী খুব টানিয়া বাঁধিলে তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। মধ্যপথই শ্রেয়। আর কার্য্যতঃ জীবনেও তাহা ত দেখা গেল। রাজভোগ এবং উপবাস দুই ই তিনি দেখিলেন কিন্তু প্রকৃতবস্তু মিলিল কই। অতএব মধ্যপথ অবলম্বন করিবার জন্য তিনি ইচ্ছা করিলেন।

যোগী সিদ্ধার্থ যোগাসন হইতে উঠিলেন। অতিকষ্টে তিনি কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া একটি বৃক্ষমূলে অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল। এমন সময় তথায় একজন রমণী বনদেবতার পূজার উদ্দেশ্যে একটি মূল্যবান পবিত্র পাত্রে পায়সান্ন লইয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপ কথিত আছে, যে, সেই রমণী তত্রস্থ বনদেবতার আশীর্ব্বাদে একটি পুত্রলাভ করেন। এক্ষণে উপযুক্ত সময়ে তিনি দেবতার ভোগের জন্য পায়সান্ন লইয়া আসেন। সেখানে আসিয়া তিনি সিদ্ধার্থকে দর্শন করিলেন, এবং তাঁহাকেই দেবতা জ্ঞানে পায়সান্ন দিলেন। সিদ্ধার্থ, তাহা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি নিরঞ্জনার স্নিগ্ধসলিলে অবগাহন স্নান করিলেন, পরে সেই রমণী প্রদত্ত পরমান্ন ভোজন করিলেন। বহুকালের পর এই প্রকারে স্নানাহার করিয়া তিনি সুস্থ বোধ করিলেন। সিদ্ধার্থের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া

তাঁহার যে পাঁচ জন শিষ্য ছিলেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সিদ্ধার্থ পুনরায় একাকী সেই নদীতীরে বন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত চিন্তাকুল। তিনি পূর্ব্বাপর কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন যে তখনও তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু দিব্যজ্ঞান তাহাকে লাভ করিতেই হইবে; ইতিপূর্ব্বে দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যে, যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সকল ত ব্যর্থ হইল। এক্ষণে তিনি মধ্যপথাবলম্বী হইলেন। এখন আর তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণাকে উপেক্ষা করিয়া দেহকে ক্লেশ দেন না। কিন্তু দিব্যজ্ঞানের জন্য, পরম সত্যলাভের জন্য ধ্যান ধারণা, পূর্ব্বের ন্যায় অব্যাহত ভাবে করিবার উদ্দেশে সিদ্ধার্থ বনস্থলীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় একটি শ্যামল পত্র শোভিত বিশাল শাখ অশ্বথ বৃক্ষ তলে শ্যামদূর্ব্বাদলের উপর পদ্মাসন রচনা করিয়া ধ্যানে বসিলেন।

ধ্যান ধারণা।

যোগশাস্ত্র কথিত কৃচ্ছ সাধনের উপর সিদ্ধার্থের আর বিশ্বাস নাই। আপনার লক্ষ্য ধ্রুবতারার ন্যায় তাঁহার সন্মুখে স্থির থাকিলেও, পন্থা সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহ হইয়াছে। বিশ্বাস ও আশার আলোক এবং সন্দেহের ছায়ার অন্ধকার যখন মানব হৃদয়ে একসঙ্গে উপস্থিত হয় তখনই মানবের প্রকৃত পরীক্ষা হয়। এই অগ্নি পরীক্ষায় কেহ পুড়িয়া ভস্মসাৎ হয় কেহ বা বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় শোভা পায়। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল মানবের জীবনে কোন সময়ে না কোন সময়ে এইরূপ সঙ্কট উপস্থিত হয়। তবে লোকের চরিত্র, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্যের তারতম্যের উপর পরীক্ষা ও সঙ্কটের কাঠিন্য ও প্রাবল্যের তারতম্য নির্ভর করে। সিদ্ধার্থের লক্ষ্য কি ছিল তাহা আমরা শুনিয়াছি। জগতের যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু পূণ্যপবিত্র তাহার প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস একদিকে, আর যাহা কিছু অসৎ, অপবিত্র, পাপময় দুঃখজনক তাহার ধ্বংসের প্রয়াস অপরদিকে। এরূপ স্থলে —সিদ্ধার্থের পরীক্ষা যে অসাধারণ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? মানুষ ব্যর্থ প্রয়াস হইলেই স্বতঃই তাহার মনে আত্মশক্তি, গৃহীত উপায় এবং উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন সে জিজ্ঞাসা করে, এই তিন-

টির মধ্যে কোন না কোন ত্রুটী আছে অন্যথা এমন হইল কেন ? এই প্রশ্নকরার পর সে অতীতের এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে বর্ত্তমান বিদ্যমান। তাহার উপর মানুষ আশা ও বিশ্বাসের আলোক লইয়া দাড়াইবার চেষ্টা করে। এই সময় মানব হৃদয় সন্দেহ এবং নিরাশার দ্বারা অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠে। সিদ্ধার্থের তাহাই হইয়াছিল। স্মৃতি তাহার নিকট তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের অতীত সকল সুখের চিত্র, নেপথ্যের পটপরিবর্ত্তনের ন্যায় একে একে, দেখাইতে লাগিল এবং সন্দেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলঃ— এই সকলের পরিবর্ত্তে তিনি কি পাইয়াছেন ? পিতার স্নেহ, পত্নীর প্রেম,এবং সুখ ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে তিনি যাহা পাইলেন তাহা কি যথেষ্ট ? যদি তাহা না হইল তবে এত কষ্ট এত দুঃখ কেন ? অন্যের দুঃখ নিবারণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য, কিন্তু তিনি নিজের দুঃখ দূর করিতে ত এ পর্য্যন্ত সমর্থ হইলেন না। স্মৃতি দেখাইতেছে যে তিনি যে পথ, যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত তাহা পরিত্যজ্য। স্মৃতি তখন সন্দেহের যুক্তি সমর্থন করিয়া অনিশ্চিতকে ত্যাগ করিয়া নিশ্চিতের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে বলিল। নিরাশা মধ্যে মধ্যে বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের মাঝে ঘন আবরণ দিয়া তাঁহার দৃষ্টি রোধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ চিত্ত-

বৃত্তির এই প্রকার বিবিধ বিকার দেখিয়া ভগ্নোগুম অথবা বিভ্রান্ত হইলেন না। তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ তর্ক বিচার দ্বারা বিশ্বাস এবং আশার সাহায্যে, পূর্ব্বস্মৃতির মোহিনী মায়া, সন্দেহের কূট তর্ক, নিরাশার অন্ধকার মন হইতে দূর করিয়া দিলেন। তাঁহার চিত্ত বিক্ষোভ দূরে গেল। চিত্ত প্রশান্ত হইল। তাহাতে আর তরঙ্গের চিহ্নমাত্র তখন রহিল না। প্রশান্ত জলরাশিতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল পূর্ণ শশধর যেমন প্রতিভাত হয় সিদ্ধার্থের অন্তরের মধ্যে অতঃপর বিবেক—দিব্যজ্ঞান সেইরূপ প্রতিভাত হইল।

সিদ্ধার্থ এত দিন যাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন এখন তাহা পাইলেন।

জীবের দুঃখের কারণ এবং সেই দুঃখ নিবারণের উপায় তিনি নির্ণয় করিলেন। সিদ্ধার্থের ধ্যান ধারণা সফল হইল। নিরঞ্জনার তীরে উরুবিল্বের উপবনে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থ পরমতত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইলেন। অশ্বত্থবৃক্ষ বোধিদ্রুম নামে কীর্ত্তিত হইল। উরুবিল্বের সেই বন ভূমি জগতের পুণ্য তীর্থে পরিণত হইল।

দিব্যজ্ঞান।

সিদ্ধার্থ জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুঃখ দূর করিবার পূর্ব্বে, দুঃখের কারণ কি তাহা জানা আবশ্যক। পীড়িতজনকে রোগমুক্ত করিতে হইলে চিকিৎসককে রোগের কারণ এবং তাহার ঔষধ উভয়ই জানা আবশ্যক। সিদ্ধার্থ ও সেইরূপ দুঃখের কারণ কি এবং কি উপায় দ্বারা তাহা দূর করা যায় জানিবার জন্য আজন্ম চিন্তা এবং চেষ্টা করিতেছিলেন; এত দিনে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, চেষ্টা সকল হইয়াছে, তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে।

সিদ্ধার্থের সন্দেহ ও নিরাশা দূরে গিয়াছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রবর্ণিত মার এবং তাঁহার কন্যাগণের—রূপ, রতি, তৃষ্ণা প্রভৃতির পরাজয় হইয়াছে। পাপের পরাজয় হইয়াছে। অনুরাগ আসক্তি সমস্তই এখন তাঁহার চিত্ত হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার চিৎ এখন নির্ব্বিকার। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি দুঃখের কারণ অবগত হইয়া বলিলেন ঃ—

(১) অবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ।

(২) সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং।

(৩) বিজ্ঞান প্রত্যয়ং নামরূপং।

(৪) নামরূপপ্রত্যয়ং ষড়ায়তনং।

(৫) ষড়ায়তনপ্রত্যয়ঃ স্পর্শঃ।

(৬) স্পর্শপ্রত্যয়া বেদনা।

(৭) বেদনাপ্রত্যয়া তৃষ্ণা।

(৮) তৃষ্ণাপ্রত্যয়মুপাদানম্।

(৯) উপাদানপ্রত্যয়ো ভবঃ।

(১০) ভবপ্রত্যয়া জাতিঃ।

(১১) জাতিপ্রত্যয়া জরামরণশোকপরিদেবদুঃখ-দৌর্ম্মনস্যোপায়াসাঃ সম্ভবন্ত্যেব কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য সমুদয়ো ভবতি সমুদয়ঃ।

(১) অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয়।

(২) সংস্কার হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

(৩) বিজ্ঞান হইতে নামরূপের উৎপত্তি হয়।

(৪) নামরূপ হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি হয়।

(৫) ষড়ায়তন হইতে স্পর্শের উৎপত্তি হয়।

(৬) স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি হয়।

(৭) বেদনা হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়।

(৮) তৃষ্ণা উপাদানের কারণ।

(৯) উপাদান ভবের কারণ।

(১০) ভব হইতে জাতির উৎপত্তি।

(১১) জাতি হইতে

জরামরণ, শোক, অনুতাপ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ প্রভৃতি সকল দুঃখের উৎপত্তি হয়।

উপরে যে কয়টি কথা বলা হইল তাহার অর্থ বুঝা আবশ্যক। উহাদের অর্থ চলিত অর্থ হইতে ভিন্ন।

(১) অবিদ্যার অর্থ ভ্রান্ত জ্ঞান, বিকৃত বোধ।

(২) ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে মনের মধ্যে সংস্কার (impression) জন্মে।

(৩) এই সংস্কার হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এই বিজ্ঞানের অর্থ Science বা Philosophy নহে। এই বিজ্ঞান বলিলে বুঝিতে হইবে উহা ইন্দ্রিয় জনিত ছয় প্রকার জ্ঞান বা বোধ (১) দর্শন (২) শ্রবণ (৩) ঘ্রাণ (৪) আস্বাদন (৫) স্পর্শ (৬) চিন্তন।

(৪) রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শের বোধ চক্ষুকর্ণাদির সহিত ঐ সকল বস্তুর সংযোগ ঘটিলে হয়। এই যে ইন্দ্রিয়গণ এবং তাহাদের গ্রাহ্য বিষয়ের সংযোগ ইহাকে "স্পর্শ" বলে।

(৫) এই "স্পর্শ" হইতে সুখ দুঃখ, এবং "না সুখ না দুঃখ" এই প্রকার বেদনা অনুভূতি perception জন্মে।

(৬) বেদনা হইতে তৃষ্ণা, বাসনা অথবা কামনা জন্মে।

(৭) তৃষ্ণা বা বাসনা হইতে উপাদান অর্থাৎ কর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

(৮) উপাদান অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক বা বাচনিক তিনপ্রকার কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের উৎপত্তি

হয়, আর এই ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ফলভোগের জন্য অর্থাৎ কর্ম্মফলের জন্য জীবগণ জন্মলাভ করে।

(৯) জীব জন্মগ্রহণ করিলেই তাহাকে জরামরণ, শোক, অনুতাপ, দুর্ভাবনা, উদ্বেগ প্রভৃতি দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

এইরূপ কার্য্য কারণ বিবেচনা করিয়া সিদ্ধার্থ দেখিলেন অবিদ্যাই সকল অনর্থের মূল – তাহাকে নাশ করিতে পারিলে জীবের সকল দুঃখ দূর করিতে পারা যায়। এই পরমতত্ত্ব, এই দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধনাম গ্রহণ করিলেন এই সময় হইতে তিনি জগতে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, তথাগত, প্রভৃতি নামে পরিচিত হইলেন।

বোধিসত্ত্ব দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ৪৯ দিবস সেই বোধিদ্রুমের নিকটে বিবিধ প্রকার ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে তিনি দুঃখ নিবারণের উপায় ও স্থির করিলেন। বুদ্ধদেব বুঝিতে পারিলেন যে অবিদ্যাকে নাশ করিতে হইলে আটটি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। সেই আটটি উপায় যথাক্রমে এই (১) পবিত্র মত (২) পবিত্র ভাব (৩) পবিত্র কার্য্য (৪) পবিত্রবাক্য (৫) পবিত্রজীবিকা (৬) পবিত্র চেষ্টা (৭) পবিত্র চিন্তা (৮) পবিত্র স্মৃতি।

বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে পর তাঁহার চিত্ত

প্রশান্ত ও প্রফুল্ল হইল। তিনি তখন প্রফুল্লমনে বলিলেন আমি দেহ রূপ গৃহের নির্ম্মাণ কর্ত্রী বাসনার অনুরোধে অনেকবার পৃথিবীতে নানাজন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছি— অহো! বার বার জন্মগ্রহণ করা কি দুঃখকর! অয়ি গৃহ নির্ম্মাণ কারিণি, আজ আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তুমি আর এগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। আমি গৃহের স্তম্ভাদি সকলই ভগ্ন করিয়া দিয়াছি। আমার সংস্কারচিত্ত বাসনার ধ্বংস করিয়াছে।"

তথাগত আত্মচিত্তের তৃষ্ণাধ্বংস করিয়া প্রশান্ত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি সকলের দুঃখ দূর করিবার জন্য জগতে তাঁহার দিব্যজ্ঞানের আলোক, পূণ্যের জ্যোতি, প্রেমের ধর্ম্ম, বিতরণ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন।

বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইবার পূর্ব্বে ভাবিলেন উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার নবধর্ম্মের কথা বলা উচিত। হয়ত সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারিবে না। তখন তিনি রুদ্রকের কথা মনে করিলেন, কিন্তু অবগত হইলেন যে রুদ্রক জীবিত নাই। পরে আষাড়-কালামের কথা মনে হইল। কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন যে আরাড়কালামও ইহজগতে নাই। বুদ্ধ-দেব ভাবিয়াছিলেন এই দুই পবিত্র চরিত্র সুপণ্ডিতের দ্বারা তাঁহার নবধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে। কিন্তু তাহা ত হইল না। অতঃপর তিনি তাঁহার পাঁচজন পূর্ব্ব সহচরের কথা স্মরণ করিলেন। তিনি অবগত হইলেন যে, কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিত, বাষ্প, মহানাম এবং অশ্বজিৎ তখন বারাণসীতে বাস করিতে-ছেন। তিনি তাঁহাদের উদ্দেশে পশ্চিমাভিমুখে বারাণসী যাত্রা করিলেন। পথে বোধিসত্ত্বের সহিত উঁপকাম নামক এক তত্ত্ব জ্ঞানী পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয়। উপকাম বুদ্ধদেবকে তাঁহার বারাণসী গমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে তথাগত বলিলেন :—

বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীং।
ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেম্বপ্রতিবর্ত্তিতম॥

আমি বারাণসী যাইব এবং কাশীনগরে গমন করিয়া সংসারে অপ্রতিহত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিব।

কিছুদিন পরে বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। বারাণসীর উপকণ্ঠে মৃগদাব নামক একটি রমণীয় আশ্রম আছে। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চসহচর এইখানে বাস করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদের সন্ধান পাইয়া মৃগদাবে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব সহচর-গণ তথাগতকে দূর হইতে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

তথাগত তাঁহাদিগের নিকটে আসিবার পূর্ব্বে, তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন—সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, অন্যথা তিনি এখানে আসিবেন কেন? যাহা হউক আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিব না। যখন তাঁহারা এইরূপে বলাবলি করিতেছেন, ইতিমধ্যে তথাগত সেখানে উপস্থিত হইলেন। বোধিসত্ত্বের তেজোদীপ্ত পবিত্রকান্তি দেখিয়া কৌণ্ডিন্যাদি ব্রাহ্মণকুমারগণ স্বতঃ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং অভিবাদন করিয়া আসন দিলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের সহিত নবধর্ম্মের গূঢ় সত্যের আলোচনা করিলেন। কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-কুমারগণ সংযমী সাধু এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রকৃততত্ত্ব না জানিতে পারিয়া এতদিন তাঁহারা ভ্রান্তপথে চলিতে-ছিলেন। এক্ষণে বোধিসত্ত্বের সাক্ষাৎলাভ করিয়া

তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তিনিও সদুত্তর-দানে তাঁহাদের সংশয় সন্দেহ ভ্রান্তবিশ্বাস দূর করিতে লাগিলেন। তথাগত বলিলেন "হে ব্রাহ্মণকুমারগণ তোমরা গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ—কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে তোমাদিগকে আরও দুইটি বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে উহার একটি ইন্দ্রিয়জনিত ভোগসুখ অপরটি অনর্থক শারীরিক ক্লেশ। বিলাস এবং বৈরাগ্য অতিভোজন এবং অনশন উভয়ই পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। এই দুই পথই ভ্রান্ত। আমি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছি। এই পথই প্রকৃষ্ট। ইহা অবলম্বন করিয়া আমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, বুদ্ধত্ব পাইয়াছি। আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমি পরম শক্তি লাভ করিয়াছি। বেদনা বা তৃষ্ণা কিছুতেই আমার চিত্ত চঞ্চল হয় না। তোমরা ও এই মধ্যপথ অবলম্বন কর। তোমাদেরও দিব্যজ্ঞান লাভ হইবে, তোমরা পরম শান্তি পাইবে। অন্তরে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইবে এবং তোমরা নির্ব্বাণের অধিকারী হইবে। সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি এই অষ্টমার্গ তোমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপ করিলে তোমরা ধর্ম্মজীবনলাভ করিতে পারিবে। এবং তোমরা জন্ম, জরামরণের অতীত হইবে। কর্ম্মফল আর ভোগ করিতে হইবে না

এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না।

হে ধর্ম্মার্থিগণ, তোমাদিগকে অষ্টমার্গের কথা বলিলাম। এক্ষণে চতুর্ব্বর্গ মহাসত্যের কথা বলিতেছি। অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রথমতঃ ইহাই সত্য বলিয়া জানিও যে জগতে কেবল দুঃখ আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা সত্য বলিয়া জানিবে যে জীবের জীবনে দুঃখ সঞ্চিত থাকে। তৃতীয় সত্য এই সে এই দুঃখ রাশিকে ধ্বংস করা যায়। আর চতুর্থতঃ ইহা সত্য বলিয়া জানিবে যে দুঃখ বিনাশ করিবার জন্য বিশেষ উপায় আছে।

এই চারিটি মহা সত্যের অর্থ তোমাদিগকে আরও বিশদভাবে বলিতেছি শ্রবণ কর। দুঃখ আছে বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে যে জীব তৃষ্ণা দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভোগ ও তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে; ইহার ফলে তাহার চিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকে। এই হেতু চিত্ত সতত চঞ্চল থাকে। তৃতীয় সত্য এই যে এই সকল দুঃখকে ধ্বংস করা যায়। ইহার অর্থ যে তৃষ্ণাকে চিত্ত হইতে দূর করিতে পারিলে, চিত্ত প্রশান্ত এবং নির্ব্বিকার হয়, সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না, বর্ণহীন স্ফটিকের, স্বাদহীন জলের ন্যায় হয়। চতুর্থ সত্য, দুঃখ বিনাশের বিশেষ পথ আছে। পূর্ব্বোক্ত অষ্টমার্গই সেই বিশেষ পথ।

আমি এই সকল সত্য কোন শাস্ত্র বা গুরুর নিকট

হইতে প্রাপ্ত হই নাই। আমি সহজ জ্ঞান এবং স্বাভাবিক বিচার শক্তি দ্বারা এই দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি সেই পবিত্র জ্ঞানের আলোকে এই সকল গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি। আমার অন্তর এখন পবিত্র জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল। সেখানে আর সন্দেহ সংশয় নাই। জগতের নিত্য পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া আর আমার চিত্ত বিভ্রম ঘটিবে না।

বোধিসত্ত্বের এই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার ধর্ম্মের দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধদেব প্রথমে কৌণ্ডিন্যকে দীক্ষিত করিলেন পরে অপর চারিজনকে দীক্ষিত করিলেন। ব্রাহ্মণকুমারগণের দীক্ষা সমাপন হইল। পুণ্য তীর্থ কাশিকাপুরীতে বৌদ্ধধর্ম্মের জয় ঘোষিত হইল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহাই ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন।

বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা এবং দীক্ষা।

ভগবান বোধিসত্ত্ব বারাণসী ধামে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া সেখানে কিছুকাল অবস্থান করিলেন। সেখানে অবস্থানকালে যশ নামক একজন ধনী বণিক নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। পরে ঐ ব্যক্তির বহু আত্মীয় ও বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি উরুবিল্ব রাজগৃহ, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, বৈশালী প্রভৃতি নানাস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই প্রচার কার্য্যের বিবরণ পরে লিখিত হইবে। প্রচার কার্য্যের বৃত্তান্ত জানিবার পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধদেব কি প্রচার করিলেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া আবশ্যক। সেই জন্য এখানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শিক্ষা ও দীক্ষার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে আমাদের দেশে অনেক ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল। সে সকল ধর্ম্ম কর্ম্মপ্রধান। ধর্ম্মের শ্রেণী বিভাগ করিতে হইলে কর্ম্মের শ্রেণী বিভাগ করা আবশ্যক। কর্ম্মের শ্রেণী বিভাগ করিতে হইলে কর্ম্মের কারণ যাহা তাহার শ্রেণীকরণ আবশ্যক। এই শ্রেণীকরণ করিবার সময়ে আমরা কর্ম্ম সকলকে, তথা ধর্ম্মমতগুলিকে, প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করি।

(১) প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম (২) নিবৃত্তি মূলক কর্ম্ম ( ) প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মূলক কর্ম্ম।

(১) কামনা—বাসনা বা তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্য যে প্রয়াস বা চেষ্টা তাহাকে প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। সংক্ষেপতঃ দুঃখ কষ্টের বর্জ্জন এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখের অনুসরণই এই কর্ম্মের লক্ষণ বলা যাইতে পারে।

(২) সংযম, বৈরাগ্য, চিত্তবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া জীবন যাপনে যে প্রয়াস তাহা নিবৃত্তি মূলক।

(৩) মানবের মধ্যে পশুভাব এবং দেবভাব দুই বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি বৃত্তি সৎ আর কতকগুলি বৃত্তি অসৎ, কতকগুলি ভাল আর কতকগুলি মন্দ। এখন যে যে বৃত্তি গুলির প্রেরণায় কার্য্য করিলে অমঙ্গল হয় সেই সেই বৃত্তিগুলিকে দমন, আর যে যে বৃত্তিগুলির প্রেরণায় কার্য্য করিলে মঙ্গল হয় সেইগুলি অনুসরণের প্রয়াস প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মূলক কর্ম্ম। ক্রোধ লোভ ইত্যাদি বৃত্তির নির্দ্দেশে কার্য্য করিলে অমঙ্গল হয় অতএব এই সকল বৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে হইবে। আর দয়া ক্ষমা প্রভৃতি বৃত্তিগুলির নির্দ্দেশে কার্য্য করিলে মঙ্গল হয় অতএব ইহার অনুসরণ করা উচিত।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত নিবৃত্তিমূলক। মানবধর্ম্ম স্থাপয়িতা

ভগবান মনুও নিবৃত্তি মূলক ধর্ম্মের বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান বুদ্ধদেব প্রত্যক্ষভাবে জগতে নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম প্রচার করেন।

বোধিসত্ত্ব দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া জীবের দুঃখের মূল কারণ কি তাহা জানিতে পারেন। এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহা হইতে নিস্তার পাওয়া যায় তাহাও অবগত হয়েন। কিন্তু এই দুই তত্ত্ব জানিবার পূর্ব্ব হইতেই তিনি পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম এবং কর্ম্মফল 'এই তিনটি বিশ্বাস করিতেন।

কর্ম্মই জীবের বার বার জন্মগ্রহণের কারণ বলিয়া বুদ্ধদেব বিশ্বাস করিতেন। জন্মগ্রহণ করিলেই সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব যাহাতে জন্ম না হয় তাহার চেষ্টাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। কর্ম্ম (ভালই হউক আর মন্দই হউক) যাহাতে না করিতে হয় তাহার জন্য বুদ্ধদেব কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। সেগুলি সমস্তই সংযমাত্মক।

এই সকল নিত্যপালনীয় নিয়ম অনুসারে জীবন যাপন করিলে ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয়। কর্ম্ম পরিশুদ্ধ হয়। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল ও তত্ত্বদর্শী হয়। ক্রমে মানবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং শেষে কর্ম্মরহিত হইয়া কর্ম্মফলের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। পরে তাহার দেহের অবসান হইলে—মৃত্যু হইলে—আর জন্ম হয় না।

সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা অনেকটা এইরূপ। বৌদ্ধধর্ম্ম অগাধ জলধি স্বরূপ। ইহার মধ্যে কত রত্ন আছে তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? ইহার মধ্যে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বকথা নিহিত আছে। তবে আপাতঃ দৃষ্টিতে, সামান্য সহজ বুদ্ধিতে যাহা দেখা যায়, যাহা বুঝা যায়, লোকে যেরূপ দেখে, যেরূপ বুঝে তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দেওয়া হইল।

বুদ্ধদেবের শিক্ষা অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক। তথাগত প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর দীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বিধি প্রচলন করেন নাই। ক্রমে যেমন যেমন আবশ্যক হইতে লাগিল তেমনি তেমনি নিয়ম গঠিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মে ধর্ম্মজীবন যাপনের জন্য দুইটি অনুষ্ঠান প্রধান। উহার একটির নাম প্রব্রজ্যা অপরটির নাম উপসম্পদা। এখানে এই দুইটি অনুষ্ঠানের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

যদি কোন ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া সেই ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে প্রথমতঃ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য তাঁহাকে প্রথমে একজন বৌদ্ধ আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইবার সময় তাঁহাকে তিন খানি পীতবর্ণ বস্ত্র সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে।

অতঃপর তিনি আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন

মহাশয়, সংসারের সকল দুঃখ নিবারণ লাভ করিবার জন্য, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব কৃপা করিয়া আমার এই তিন খানি পীত বস্ত্র গ্রহণ করুন। তিন বার এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে। দীক্ষার্থী এইরূপে তিনবার প্রার্থনা জানাইলে আচার্য্য দীক্ষার্থীর হস্ত হইতে বস্ত্রতিনখণ্ড গ্রহণ করিবেন। ইহার পর দীক্ষার্থী বলিবেন মহাশয়, সংসারের সকল দুঃখের নিবারণ এবং নির্ব্বাণ লাভ করিবার জন্য আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। কৃপা করিয়া আমার হস্তে পীত বস্ত্র প্রদান করুন। এই প্রার্থনা তিনবার জানাইতে হইবে। আচার্য্য দীক্ষার্থীর হস্তে বস্ত্র তিন খণ্ড দিবেন ; এবং তাঁহাকে উহার একখণ্ড কৌপীন, এক-খণ্ড বর্হিবাস এবং তৃতীয় খণ্ড উত্তরীয় রূপে ব্যবহার করিতে বলিবেন। তখন, দীক্ষার্থী পীতবসন যথারীতি পরিধান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন, মহাশয়, আমি সংসারের সকল দুঃখ নিবারণ এবং নির্ব্বাণলাভ করিবার জন্য প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিতেছি। এই প্রার্থনাও তিনবার জানাইতে হইবে। পরে তাঁহাকে ত্রিশরণ এবং দশকুশল প্রার্থনা করিতে হইবে।

দীক্ষার্থী বলিবেন মহাশয়, আমি ত্রিশরণ এবং দশকুশলধর্ম্ম প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আমাকে শীলদান করুন। এই প্রার্থনা তিনবার উচ্চারণ

করিলে, আচার্য্য দীক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলাইবেন।

(১) সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার করিতেছি।

(২) আমি বুদ্ধের শরণ লইতেছি।

আমি ধর্ম্মের শরণ লইতেছি।

আমি সঙ্ঘের শরণ লইতেছি।

এই সকল মন্ত্র তিন বার উচ্চারণ করিবার পর দীক্ষার্থীকে দশকুশল প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে। দশকুশল প্রতিজ্ঞা যথা :—

(১) আমি প্রাণিবধ করিব না।

(২) আমি পর দ্রব্য অপহরণ করিব না।

(৩) আমি ব্যভিচার করিব না।

(৪) আমি মিথ্যা কথা বলিব না।

(৫) আমি প্রমাদের নিমিত্ত মদ্যপান করিব না।

(৬) আমি অপরাহ্নে আহার করিব না।

(৭) আমি নৃত্য গীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করিব না।

(৮) আমি বিলাসের জন্য গন্ধমাল্য ব্যবহার করিব না।

(৯) আমি উচ্চ আসন, উচ্চ শয্যা প্রভৃতিতে উপবেশন বা শয়ন করিব না।

(১০) আমি স্বর্ণ রৌপ্য প্রতিগ্রহ করিব না।

এই দশটি প্রতিজ্ঞাও তিন বার উচ্চারণ করিতে হইবে।

অতঃপর আচার্য্য বলিবেন ত্রিশরণ সহিত দশকুশল ধর্ম্ম উত্তমরূপে রক্ষা করিবে এবং অপ্রমাদে কালযাপন করিবে, দীক্ষার্থী বলিবেন যে আজ্ঞা মহাশয়।

বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথমদীক্ষার অনুষ্ঠান অর্থাৎ প্রব্রজ্যা এই ভাবে করিতে হইবে। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর দীক্ষিত ব্যক্তিকে অন্ন বস্ত্র শয়নাদি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পথে আরও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভিক্ষুসম্প্রদায়ভুক্ত হয়েন। ভিক্ষুসম্প্রদায়ভুক্ত হইলে উপসম্পদা গ্রহণ নামক একটি অনুষ্ঠান করিতে হয়। যিনি উপসম্পদা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তিনি প্রথমতঃ একজন শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুকে আচার্য্য বা উপাধ্যায় মনোনীত করিবেন; এবং অনুষ্ঠানের জন্য একটি ভিক্ষা পাত্র, এবং তিন খানি কাষায় বস্ত্র সংগ্রহ করিবেন। এই সকল করা হইলে মনোনীত আচার্য্য উপসম্পদা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে ভিক্ষু সঙ্ঘের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে উপসম্পদা দান করিবার অনুমতি চাহিবেন। পরে আচার্য্য উপসম্পদা প্রার্থী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি সংবাদ সংগ্রহ করিবেন।

(১) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। কুষ্ঠ—গণ্ড অপস্মার প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি উপসম্পদা গ্রহণের অযোগ্য।

(২) বয়স, বিংশতিবর্ষ পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

(৩) পিতামাতার অনুমতি পাওয়া আবশ্যক।

(৪) পুরুষ কি স্ত্রী।

(৫) স্বাধীন কি পরাধীন, রাজভৃত্য কিনা।

(৬) অঋণী কিনা

(৭) ভিক্ষাপাত্র ও চীবর সংগ্রহ করা হইয়াছে কিনা.

এই সকল প্রশ্নের সন্তোষ জনক উত্তর পাইলে আচার্য্য উপসম্পদা গ্রহণেচ্ছুর নাম জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে উপসম্পদা গ্রহণেচ্ছু আপনাকে "নাগ" এই নামে পরিচয় দিবেন। "নাগ" নামে পরিচয় দিবার অভিপ্রায় এই যে তিনি সর্পের ন্যায় হিংসুক ও পাপী।

ইহার পর উপসম্পদা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি ভিক্ষুসঙ্ঘকে অভিবাদন করিয়া তিনবার উপসম্পদা যাজ্ঞা করিবেন। তখন সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী মৌনভাব দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিবেন। এইরূপে ভিক্ষু সঙ্ঘের সম্মতি পাইলে, আচার্য্য আরও কয়েকটি প্রশ্ন ও অনুষ্ঠান করেন। পরে তিনি উপ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে বলিবেন, অদ্য হইতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন আপনার আহার্য্য, পাংশুরাশি হইতে সংগৃহীত চীবর আপনার পরিধেয়। বৃক্ষতলই আপনার বাসস্থান। গোমূত্রই আপনার ঔষধ। আপনি যতদিন জীবিত

থাকিবেন ততদিন উৎসাহের সহিত এই নিয়মগুলি পালন করিবেন। ইহার পর আচার্য্য পুনরায় তাঁহাকে আরও চারিটি বিষয়ে উপদেশ দিবেন। উহার মধ্যে ক্ষুদ্রতম প্রাণীবধনিষেধ একটি বিশেষ উপদেশ। অতঃপর উপসম্পন্ন ব্যক্তি ত্রিচীবর (কৌপীন, বহির্ব্বাস ও উত্তরীয়) পরিধান পূর্ব্বক, নাগ নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, "ধর্ম্মপাল" "ধর্ম্মরক্ষিত" ইত্যাদি কোন নাম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। দীক্ষিত ব্যক্তিকে কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে হয়। বোধিসত্ত্ব যে নবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন তাহার মত এবং তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রধান দুইটি অনুষ্ঠানের কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ বলিলে কি বুঝায়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল। এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সহিত দেশের লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং নীতির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতে ছিল, তাহাও বুঝা যাইবে।

নবধর্ম্ম প্রচার।

বোধিসত্ত্ব বারাণসী কাশিকাপুরীতে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করা হইল। এই স্মরণীয় ঘটনার পর বুদ্ধদেব কিছুকাল বারাণসীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার এই অবস্থান কালে যশ নামক একজন ধনী বণিক তাঁহার ধর্ম্মের মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। বুদ্ধদেব ধর্ম্মার্থী বণিককে নবধর্ম্মের সকল কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের শীতল ছায়া দান করিলেন। যশ নবধর্ম্মের শরণে আসিয়া পরম শান্তি লাভ করিলেন। তাঁহার চরিত্রে, আচার ব্যবহারে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহার দেহে, মুখমণ্ডলে পুণ্যের সংযমের বিমলজ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হইল। বিষয়ী বণিকের এই অসাধারণ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন নবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং ক্রমে তাঁহারা সকলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ক্রমে দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৬১ জন হইল। ভিক্ষু-সঙ্ঘ গঠিত হইল। ইহাঁরা তথাগতের আদেশে নানা স্থানে নবধর্ম্মের অমৃতকথা প্রচার করিতে যাত্রা করিলেন। নবধর্ম্মের প্রচারের কার্য্য আরম্ভ হইল।

অতঃপর বুদ্ধদেব বারাণসী হইতে উরুবিল্বে আগমন করিলেন। উরুবিল্ব বর্ত্তমান গয়ার নিকটে। এখানে আসিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে অনেকগুলি বিলাসী ধনীর সন্তানকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। যে সকল যুবক কিছুদিন পূর্ব্বে বেশ ভূষার পারিপাট্যে, বিলাস বিভ্রমের বাহুল্যে নগরবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন, যাঁহাদের সুখৈশ্বর্য্য দেখিয়া অল্পবিত্ত যুবকগণ ঈর্ষ্যা করিতেন, এবং আপনাদিগকে ধিক্কার দিতেন, এখন তাঁহারা সকলেই নবধর্ম্মে দীক্ষিত যুবকগণের আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কোথায় তাঁহাদের সে সুচিক্কণ বসন, সে সুন্দর ভূষণ, সে ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ, সে কুসুম চন্দনচর্চ্চিত দেহ! এখন তাঁহাদের মস্তক মুণ্ডিত, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফ বর্জ্জিত, দেহ পীত বসনাচ্ছাদিত, করে কমণ্ডলু। হায়! হায়! কে এমন করিল? এই প্রশ্ন পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, দরিদ্রের কুটীরে, ধনীর বৈঠকে সর্ব্বত্র শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমেই তথাগতের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। লোকে, ধনী নির্ধনী, পণ্ডিত মূর্খ, স্ত্রী পুরুষ সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল বুদ্ধদেবের নিকট এমন কি মন্ত্র আছে যাহা দ্বারা মানুষের এমন পরিবর্ত্তন হয়। লোকে তাঁহার ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল। তাঁহার নিকট দলে দলে লোক যাইতে লাগিল।

তিনি তাহাদিগকে নবধর্ম্মের মহিমা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

একে ত এই ঘটনাতে নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার উপর আবার অল্পদিন পরেই তথাগত তিনজন বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। যে তিন জনকে দীক্ষিত করিলেন তাঁহাদের একজনের নাম, উরুবিল্ব কাশ্যপ—অপরের নাম গয়াকাশ্যপ তৃতীয়ের নাম নদীকাশ্যপ। ইহাদের প্রত্যেকেরই বহুশত শিষ্য ছিল। সুতরাং এইরূপ বহুশিষ্যের গুরুগণ তাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নবধর্ম্ম গ্রহণ করাতে বুদ্ধ দেবের নবধর্ম্মের মাহাত্ম্য চতুর্দ্দিকে আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

ভগবান বুদ্ধদেব উরুবিল্বে কিছুকাল অবস্থান করিয়া গয়াশীর্ষ নামক পর্ব্বতে গমন করেন। সেখানে তিনি কিছুদিন বাস করিলেন।

অতঃপর তিনি রাজগৃহে আগমন করিলেন। বুদ্ধদেব ইহার পূর্ব্বে আর একবার রাজগৃহে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি নবীন সন্ন্যাসী। রাজগৃহ মগধের রাজধানী। বিম্বিসার তথাকার রাজা। শিল্পকলায় নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। মানব চেষ্টায় রাজনগরী সুশোভনা হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু প্রকৃতিও রাজগৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে কৃপণতা করেন নাই। রাজগৃহ গয়ার পূর্ব্বে এবং পাটনার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।

রাজগৃহের চারিদিকে পর্ব্বত প্রাকার। স্মরণাতীতকালে এখানে রাজা জরাসন্ধের দুর্গ ছিল। রাজগৃহ পর্ব্বত-বেষ্টিত। বৈভারগিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি এবং স্বর্ণগিরি এই নগরকে বেষ্টন করিয়া আছে। বিশাল উপত্যকা ভূমিতে রাজগৃহ শোভা পাইতেছে। গিরিশ্রেণীর পাদদেশে অনন্তঋষিকুণ্ড, সপ্তঋষিকুণ্ড, কশ্যপ-ঋষি কুণ্ড, চন্দ্রমা কুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি উষ্ণপ্রস্রবণ প্রকৃতির মহিমা প্রকাশ করিতেছে। ভগবান বুদ্ধদেব বিম্বিসারের এই সুশোভনা নগরীতে পদার্পণ করিয়া মগধ-রাজকে কৃতার্থ করিলেন। নগরীকে পবিত্র করিলেন।

তথাগত কয়েকজন শিষ্যকে লইয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন বোধিসত্ত্বের একজন শিষ্য নগরমধ্যে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়াছেন। পথি-মধ্যে সঞ্জয় নামক একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর শিষ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ইহাঁর নাম সারিপুত্র। সারিপুত্র বোধিসত্ত্বের শিষ্যের সৌম্য আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সৌম্য, আপনার অলোকসামান্য সুন্দর আকৃতি দেখিয়া আপনার পরিচয় জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে। আপনি কাহার শিষ্য, আপনার ধর্ম্ম কি আমাকে বলুন। ভিক্ষু অশ্বজিৎ সারিপুত্রকে যথাযথ পরিচয় দিলেন।

তিনি আরও বলিলেন, সকল পদার্থ, হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাগত তৎসমুদয় পদার্থের হেতু নির্ণয় করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। এবং কি উপায়ে সেই সকল হেতুর ধ্বংস হয় তাহাও তথাগত বলিয়া দিয়াছেন"

সঞ্জয়শিষ্য ভিক্ষুর কথা শুনিয়া সত্যের আলোক পাইলেন। তিনি তখন তাঁহার বন্ধু, সঞ্জয়ের অপরশিষ্য, মৌদ্‌গল্যায়নের নিকট সমস্ত ঘটনা বলিলেন এবং তথাগতের ধর্ম্মের তত্ত্বকথা বুঝাইয়া দিলেন। সারিপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহারা পূর্ব্ব গুরু সঞ্জয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তথাগতের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পদারবিন্দ পূজা করিয়া নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সারিপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নের অনুগত অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন তাহারাও ইহাদের পদাঙ্কের অনুসরণ করিলেন।

যখন সঞ্জয়ের শিষ্যদ্বয় এবং তাঁহার অনুগত ব্রাহ্মণবর্গ নবধর্ম্মগ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে মহারাজ বিম্বিসার যষ্ঠিবনে ভগবান বোধিসত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তথাগতের দিব্যকান্তি দেখিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময়ীবাণী শ্রবণ করিয়া মহারাজ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ভাবাবেগে ভক্তিগদ্‌গদ্‌-চিত্তে তিনি তথাগতের চরণ বন্দনা করিলেন। পরে তিনি তথায় নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। মহারাজের

সহিত বহুসহস্র ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহারাও নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। অতঃপর মহারাজ, বুদ্ধদেব এবং তাঁহার মৃগদাবের পঞ্চ শিষ্যকে রাজভবনে ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তথাগত সশিষ্য মহারাজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। মগধাপতি মহারাজ বিম্বিসার কৃতকৃতার্থ হইলেন।

এই ঘটনার পর মহারাজ, বুদ্ধদেব এবং তাঁহার ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রীতির জন্য তদীয় পরম রমণীয় বেণুবন নামক উদ্যান উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

পর্ব্বতমালা শোভিত রাজগৃহ নবধর্ম্মের প্রভাবে টলমল করিতে লাগিল।

জন্মভূমিদর্শন।

কয়েক জন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহারাজ বিম্বিসার এবং তাঁহার অনুগত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াতে জনসাধারণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধ-দেবের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। যাহাহউক সে ক্রোধ ক্রমে কমিল। বুদ্ধদেব আরও কিছুকাল রাজগৃহে অবস্থান করিয়া জন্মভূমি কপিলবাস্তু যাত্রা করিলেন। তথাগত কপিলবাস্তু নগরের বাহিরে বিশাল বটবৃক্ষ শোভিত বিস্তৃত উদ্যানে (ন্যগ্রোধারামে বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সহিত উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই মনো-রমস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন; পরে একদিন বুদ্ধদেব শিষ্যগণের সহিত রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন রাজধানী ত্যাগ করেন, তাঁহার তখনকার অকৃতি বেশ ভূষা এমন কি নাম পর্য্যন্ত এখন নাই। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে পীতবাস, হস্তে ভিক্ষাপাত্র। রাজা শুদ্ধোধন পূর্ব্বেই পুত্রের আগমনের সংবাদ পাইয়া ছিলেন। এক্ষণে তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হওয়াতে বৃদ্ধরাজা, পুত্রের নিকট আসিলেন। এবং তথাগতকে ভিক্ষার কথা প্রশ্ন করিলেন। মহারাজ ত তাঁহাদের সকলের আহার সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিতেন তবে কেন তিনি রাজপুত্র হইয়া লজ্জাজনক ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ

করিলেন। ইহার উত্তরে তথাগত বৃদ্ধরাজাকে সকলকথা বুঝাইয়া বলিলেন। বুদ্ধদেব বলিলেন তিনি এখন যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ইহাই নিয়ম। তিনি কুল এবং কুল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব সেই সঙ্গে সঙ্গে কুলাচারও ত্যাগ করিয়াছেন। যাহাহউক ইহাতে মহারাজের লজ্জিত এবং দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। এক্ষণে তথাগত যে অমৃতের সংবাদ পাইয়াছেন তাহা মহারাজকে শুনাইবেন বলিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

বৃদ্ধরাজা তথাগতকে রাজপুরী মধ্যে লইয়া গেলেন তথায় সকলে উপস্থিত হইলেন, কেহ তথাগতকে দেখিবার জন্য, কেহ তাঁহার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, কেহ বা পূর্ব্ব স্নেহ অনুরাগ বশতঃ কেহ বা তাহার নবধর্ম্মের অমৃতকথা শুনিবার জন্য, তথায় সমাগত হইলেন। তথাগতকে দেখিয়া কাহারও চক্ষে জল, কাহারও মুখে বিস্ময় দেখা গেল। অস্ফুটস্বরে কেহ বা প্রশংসা কেহ বা নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কেহ বা তাঁহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করিতেছেন যে রাজপুত্রের ধর্ম্মে নাকি সকল জীবে দয়ার কথা বলে, যদি তাহা হয়, তবে বৃদ্ধপিতা, শোকাকুলা পত্নী, অনাথ পুত্রের উপর তাঁহার দয়া কোথায়? সমাগত জনমণ্ডলী এই রূপে কত ভাবে কত কথা বলিতেছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তথাগত তাঁহার ধর্ম্মের অমৃতবাণী সকলকে বলিতে লাগিলেন। একেই সেই দিব্যকান্তি, তাহাতে আবার মধুরকণ্ঠের স্বর! তথাগত পুণ্যজ্যোতি বিস্ফারিত নেত্রে জনমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নবধর্ম্মের অমৃতকথা বলিতে লাগিলেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা তথাগতের যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা নবধর্ম্মের সত্য সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

তথাগতের দর্শনলাভ করিবার জন্য রাজপুরীর সকলেই উৎসুক ও ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু একজনকে সেখানে দেখা যায় নাই। সেই পতিপ্রাণা যশোধরা সেখানে উপস্থিত হয়েন নাই। ইহা তাঁহার আগ্রহের অভাব বা অভিমানের জন্য নহে। তিনি জানিতেন, বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার স্বামী—তাঁহার দেবতা—তাঁহাকে দর্শন দিবেন। যথা সময়ে তথাগত যশোধরার সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার কক্ষে গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন যশোধরা ভূমিতে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে যে অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছিলেন তাহার আর কিছুমাত্র নাই। পূর্ব্বের স্মৃতি ছিল বলিয়া বোধ হয় যশোধরার ছায়াকে চিনিতে পারিলেন। যশোধরা তথাগতের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী। তিনি তথাগতকে দেখিয়া সামান্যা নারীর ন্যায় কাতরা হইয়া অশ্রুপাতে তথাগতকে

ব্যাকুল করিলেন না। তথাগত তাঁহাকে ধর্ম্মের কথা শুনাইলেন। যশোধরার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর তিনি ন্যগ্রোধারামে চলিয়া গেলেন। ইহার কয়েক দিন পরে যশোধরা তাঁহার শিশুপুত্র রাহুলকে তথাগতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তথাগত যে তাঁহার পিতা ইহাও তিনি রাহুলকে বলিয়া দিলেন। বালক পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। বালক পিতার অনুগমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তথাগত তদীয় শিষ্য সারিপুত্রকে রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। বালক পীতবসন পরিধান করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল।

দিগ্বিজয়।

বুদ্ধদেব অভিলষিত কাল কপিলবাস্তুতে বাস করিয়া পরে শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে তিনি অনাথপিণ্ডদের জেতবন নামক উদ্যানে বাস করেন। এখানে তিনি অনেক লোককে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রাজগৃহে রাজা বিম্বিসার, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধভিক্ষুগণের জন্য বেনুবণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডদ তাঁহার সুরম্য জেতবন বুদ্ধদেবকে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। অনাথপিণ্ডদ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য অগণন ধনরাশি ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দানশীল ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে উপস্থিত হইলে কেহ অভুক্ত থাকিত না। দীন দুঃখী নিরাশ্রয় অনাথগণ তাঁহাকে অনাথপিণ্ডদ (অনাথের আহারদাতা) নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল সুদত্ত।

তথাগত শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং বর্ষাকাল সেখানে অতিবাহন করিলেন। বর্ষার শেষে তিনি বৈশালী যাত্রা করিলেন। সেখানে তিনি বৃদ্ধরাজা শুদ্ধোদনের পীড়ার সংবাদ পাইলেন। শুদ্ধোদনের বয়স তখন ৯৭ বৎসর। এই বয়সে কঠিন পীড়া হইয়াছে শুনিয়া বুদ্ধদেব বুঝিলেন বৃদ্ধরাজার জীবনের আশা নাই। তিনি সত্বর গমনে কপিলবাস্তুতে উপস্থিত হইলেন।

বুদ্ধদেব সংসারত্যাগী হইয়াছেন, পিতৃদত্ত নাম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু পুত্রের কর্ত্তব্য ভুলেন নাই, মহাজন চরিত্র রহস্যময়। পিতা পুত্রে পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। মুমূর্ষ রাজা, সিদ্ধার্থ আসিয়াছেন শুনিয়া পুনরায় সংজ্ঞা-লাভ করিলেন—পুত্রমুখ দর্শন করিলেন—পুত্র স্পর্শ করিলেন—তাঁহার ম্লান চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। ক্রমে চক্ষু পলকহীন—জ্যোতিহীন হইল—স্বর রুদ্ধ হইল—দেহ নিশ্চল শীতল হইল। শুদ্ধোদনের অমরআত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পুত্র পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। শুদ্ধোদন এতদিনে সিদ্ধার্থ হইলেন।

বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করিবার পর রাজ-সংসার শ্রীহীন হইয়াছিল। তাঁহার অভাবে এতদিন যিনি সেই শ্রীহীন সংসার রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তিনিও চলিয়া গেলেন। রাজপরিবারবর্গ, রাজ আমাত্য, ভৃত্যবর্গ, মোহ ও স্বার্থবশে শোকাকুল হইল। বুদ্ধদেব সকলকে সান্ত্বনা দিলেন। এই সময়ে রাজ পরিবারবর্গের অনেকে বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধা রাণী প্রজাবতী এবং যশোধরা বুদ্ধদেবের অনুগমন করিলেন।

বুদ্ধদেব কপিলবাস্তু হইতে কৌশাম্বী নগরে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রস্থ পর্ব্বতে কয়েক মাস বাস করিলেন; পরে বর্ষার শেষে শরৎকাল আসিলে তিনি পুনরায় রাজ-

গৃহে আসিলেন। বেণুবন তাঁহার প্রিয় বিহার-ভূমি। এবার বেণুবনে বাস কালে, তিনি শুনিলেন বিম্বিসারের মহিষী ক্ষেমা বৌদ্ধধর্ম্মের শরণে আসিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি প্রজ্ঞাবতী, যশোধরা এবং শাক্যপরিবারের কয়েকজন মহিলাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা করেন। সুতরাং ক্ষেমার, দীক্ষা গ্রহণে আর বিলম্ব হইল না। ক্ষেমা দীক্ষিতা হইলেন। এই সকল এবং অপর কয়েকজন মহিলাকে লইয়া একটি ভিক্ষুণী সম্প্রদায় গঠিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে ইঁহারা বহুল সাহায্য করিয়াছিলেন।

তথাগত বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে যেখানে যেখানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা অতি সংক্ষেপে বলা হইল। তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর তিনি ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাঁহার অসংখ্য শিষ্য হইল। দেশের রাজা, রাজমহিষী, রাজপুত্র, ধনী এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মের শরণ লইতে লাগিলেন। জনসাধারণ, সকল সময়ে, রাজা, ধনী এবং পণ্ডিতগণের কার্য্য অনুকরণ এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া থাকে। সে কালেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। জনসাধারণের মধ্যে অনেকে প্রকৃত

পুণ্য পিপাসার জন্য, অনেকে অনুকরণ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। দেশময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্রোত প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। নানাস্থানে বিহার, আরাম, চৈত্য নির্ম্মিত হইতে লাগিল। দেশ মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অনেক কমিয়া গেল; যাগযজ্ঞ উপলক্ষে পশুবলি প্রায় উঠিয়া যাইতে লাগিল। বিশদ-বস্ত্রশোভিত, উপবীতধারী, শিখামণ্ডিত, মুণ্ডিতশীর্ষ ব্রাহ্মণের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল—তাঁহাদের স্থলে কাষায় বস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক, ভিক্ষাপাত্র হস্তে শ্রমণগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারতের সনাতন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বর্ণ বিভিন্নতার স্থলে শ্বেত পীত, কাষায় প্রভৃতি বস্ত্রের বর্ণ বৈচিত্র লক্ষিত হইতে লাগিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিয়া অনেক স্থলে ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধদেবের বিরোধী হইলেন। কথিত আছে একবার কতকগুলি ব্রাহ্মণ অসদুপায়ে তাঁহাকে লোকের নিকট হীনচরিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল বিকৃতবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। সত্যের জয় হইল। তথাগত মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় একবার তাঁহার শিষ্যগণের

মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তাঁহার নিকটআত্মীয় দেবদত্ত বুদ্ধদেবের খ্যাতি প্রতিপত্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হয় এবং একবার রাজগৃহে তাঁহার প্রাণ বধের চেষ্টা করে। কিন্তু পাষণ্ডের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শত্রুগণ ভগবান বোধিসত্ত্বের যতই প্রতিকূল আচরণ করিতে লাগিল ততই তাঁহার পুণ্য প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। তিনি নবধর্ম্মের সাহায্যে লোকের পাপ তাপ দূর করিতে লাগিলেন। লোকে দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্র পতাকাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দুঃখ, কষ্ট, পাপ, তাপ, হিংসা, দ্বেষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে লাগিল। ভগবান বুদ্ধদেব দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মবীররূপে সর্ব্বত্র পূজিত হইতে লাগিলেন।

প্রেম বিতরণ।

যখন ভগবান বোধিসত্ত্ব ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া তত সহজ ব্যাপার নহে। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচলিত থাকায় জাতিভেদ যে ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। উচ্চবর্ণের লোকেরা হীনবর্ণের লোক-দিগকে অবজ্ঞা করিতেন। নীচ জাতির স্পর্শ অশুচিকর বলিয়া বিবেচিত হইত। নীচজাতির অন্ন-জল কেহ গ্রহণ করিতেন না। শূদ্রের প্রতি নানা অত্যাচারের কথা শুনা যায়। শূদ্রের ধর্ম্মে অধিকার ছিল না। দেবস্থানে গমন করিবার তাহার অধিকার ছিল না। একেই প্রবল, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে; তাহার উপর তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মমত সকল—সেই সকল অত্যাচার সমর্থন করিত। নীচজাতীয় লোকেরা ভাগ্যকে দোষ দিয়া সকল অত্যাচার সহ্য করিত।

এই ত এক প্রকার অত্যাচার ছিল। তাহার পর পাপী এবং দুষ্কৃতের উপর অত্যাচার কম ছিল না। পতিত এবং দুষ্কৃতজনকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। সমাজ পাপ অপেক্ষা পাপী, দুষ্ক্রিয়া অপেক্ষা দুষ্কৃত, ব্যভিচার অপেক্ষা ব্যভিচারীকে অধিক ঘৃণা করিতেন।

যদি সমাজ পাপ, দুষ্ক্রিয়া,ব্যভিচার প্রভৃতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, তবে সমাজে ঐ সকল থাকিতে পারিতনা। কিন্তু তাহা করা হইত না। বিলাসী ধনী, লোভী, হিংসা-পরায়ণ, ইন্দ্রিয় সুখ সেবী দুর্ব্বলচিত্ত লোকেরা পাপ দুষ্ক্রিয়া ব্যভিচার প্রভৃতির প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিত না। তাহাদের দ্বারাই পাপের বীজাঙ্কুর সমাজে পরিপুষ্ট হইয়া থাকিত।

ভগবান বুদ্ধদেবের এই সমস্ত বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি যথা সময়ে ইহার প্রতীকার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। তাঁহার নবধর্ম্মে ভিক্ষুর পরদত্ত পিণ্ডভোজনের ব্যবস্থা থাকাতে উচ্চ এবং নীচ জাতির মধ্যে আবহমান প্রচলিত ঘৃণার ভাব দূরে গেল। ভগবান বোধিসত্ত্ব স্বয়ং এবং ভক্তগণ সমাজের নিকট হইতে পিণ্ড-গ্রহণ করিতেন সত্য ; কিন্তু তিনি এবং তাঁহার ভক্তগণ সমাজের ধনী নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, দীন হীন পতিত জনকে যে কত প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে ?

বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনা আলোচনা করিলে তাঁহার অনন্ত প্রেমের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

অহিংসা পরমধর্ম্ম এই অমৃতময়ীবাণী তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হওয়াতে নির্ব্বাক পশুগণ ঘাতকের খড়্গ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। তাঁহার এই প্রেমের পরিচয়

পাইয়া বহুকাল পরে বঙ্গের অমর বৈষ্ণবকবি ভক্তি ও প্রশংসাপূর্ণ হৃদয়ে গাহিয়া ছিলেন ঃ—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম,
কেশব ধৃতবুদ্ধ শরীর জয়জগদীশ হরে।

দুষ্কৃত, পতিত, হীনজনকে তিনি স্বয়ং কত প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের পুণ্যকাহিনী হইতে দু চারিটি ক্ষুদ্র অখ্যায়িকা মাত্র এখানে বর্ণিত হইতেছে।

শরতকাল। শুক্লপক্ষ। আকাশে কোথায় একটু মেঘ নাই। চন্দ্রমা আকাশ হইতে জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিতেছে। শীতল বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে। দৈনিক রাজকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। রাজা অজাতশত্রু প্রাসাদের ছাদের উপর আসিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন সেই জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীর শোভা দেখিয়া প্রাণের জ্বালা, বিবেকের দংশন, আত্মগ্লানি হইতে নিস্তার পাইবেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি পিতৃহত্যা করিয়া রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছেন। হত্যাকারীর শান্তি কোথায়? অজাতশত্রু প্রাণের জ্বালা, আত্মগ্লানি হইতে নিস্তার পাইবার জন্য শান্তি এবং সান্ত্বনা লাভের আশায় কত কত দার্শনিক পণ্ডিত, কত কত ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট গিয়াছিলেন কিন্তু কাহারও নিকট শান্তি এবং সান্ত্বনা পাইলেন না। তিনি রাজরাজেশ্বর হইয়া, অতুল

ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া বিলাস বিভ্রমের মধ্যে থাকিয়াও প্রাণের জ্বালায় অস্থির হইয়াছেন। কোথায় গেলে, কি করিলে শান্তি পান, সেই চিন্তায় আকুল। প্রাসাদের সেই বিস্তৃত ছাদের উপর তিনি পদচারণা করিতেছেন। সঙ্গে কয়েকজন অনুগত বিশ্বস্ত আমাত্য আছেন।

ভিষকশ্রেষ্ঠ জীবক তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। জীবক দেহের ব্যাধির উপশম করিতে পারেন। অজাতশত্রুর সেই ভীষণ পাপজনিত অন্তরের ব্যাধির জন্য তিনি কি ঔষধ দিবেন? জীবক সকলই জানিতেন। তিনি শেষে, পিতৃহন্তা রাজাকে সর্ব্বতাপহারক ভগবান বোধিসত্বের শরণ লইতে পরামর্শ দিলেন। এই সময়ে তথাগত নগরের উপকণ্ঠে এক বিশাল মনোরম আম্র-কাননে বহুশিষ্যের সহিত বাস করিতেছিলেন। জীবকের পরামর্শ শুনিয়া রাজা তথায় গমন করিবার জন্য যান বাহন সজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন। রাজাদেশ ত্বরিতে প্রতিপালিত হইল। রাজা জীবককে সঙ্গে লইয়া ভগবান বুদ্ধদেবের সমীপে উপনিত হইলেন। তাঁহাকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া রাজা সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন। ক্রমে রাজা আত্মকথা বুদ্ধদেবের সমীপে নিবেদন করিলেন। পরে ভগবান তথাগত রাজাকে তাঁহার ধর্ম্মের অমৃতের সংবাদ দিলেন। রাজা নবধর্ম্মের গূঢ় সত্য সকল উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম

করিলেন। তখন রাজা নিজকৃত পাপ এবং নবধর্ম্মের পাবনী শক্তি স্পষ্টতর বুঝিতে পারিলেন। অজাতশত্রু স্বকৃত পাপের বেদনা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি কাতর কণ্ঠে তথাগতকে বলিলেন, আমি পিতৃহন্তা মহাপাপী। পিতৃশোণিতপাতে আমি সকলই কলঙ্কিত করিয়াছি। আমি বিষয় লালসায় প্রলুব্ধ হইয়া দেবতা সদৃশ পিতৃদেবকে হত্যা করিয়াছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। হে দয়াময়, আমি আপনার শরণ লইলাম। আমাকে ত্রাণ করুন।

অজাতশত্রুকে এতাদৃশ অনুতপ্ত দেখিয়া প্রেমের অবতার, ক্ষমার দেবতা, ভগবান বুদ্ধদেব রাজাকে বলিলেন :—

হে রাজন্, আপনি পাপবাসনার বশে এইরূপ নৃশংসকার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি যে ঐ পাপ কার্য্যের ভীষণতা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন এবং নিজকৃত পাপ, সকলের সম্মুখে অকপটচিত্তে স্বীকার করিলেন অতঃপর আপনাকে ধর্ম্মের আশ্রয় দিতে আপত্তি দেখি না। এক্ষণে আপনি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। আমার বিশ্বাস, যে ব্যক্তি, পাপের স্বরূপ অবগত হইয়াছে, তাহার ভীষণতা বুঝিতে পারিয়াছে, সে আর পাপ করিবে না।

বুদ্ধদেবের বাক্য সফল হইয়াছিল। অজাতশত্রু বৌদ্ধ ধর্ম্মের শরণে আসিয়া, প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া

ভারতে কি কি কীর্ত্তি করিয়াছিলেন ইতিহাস অদ্যাপি তাহার পরিচয় দিতেছে। বুদ্ধদেবের প্রেমের ধর্ম্মে পাষাণে যে ফুল ফুটিল, কঠোর কালে ও তাহার সৌরভ হরণ করিতে পারে নাই। আজিও আমরা বৌদ্ধ অজাতশত্রুর চরিত্রের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য, কল্পনায় অনুভব করিতেছি।

ভগবান বুদ্ধদেব নবধর্ম্মের প্রচার কল্পে সশিষ্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একদা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি বৈশালী নগরীতে উপস্থিত হইয়া নিকটস্থ আম্রকাননে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথাগত সশিষ্যে নগরে আসিয়াছেন এই সংবাদ ত্বরিতগতিতে সর্ব্বত্র প্রচালিত হইল। তথাগতের প্রশংসা, পুষ্পের সৌরভের ন্যায় পূর্ব্বেই নগরে পঁহুছিয়াছিল। লোকে তাঁহার সম্বন্ধে, তাঁহার শিষ্যগণের সম্বন্ধে, তাঁহাদের ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, অলৌকিক ক্ষমতা, অসামান্য দয়া, সর্ব্বপাপহারিণী ক্ষমা, বিশ্বব্যাপিনী উদারতার কত কাহিনী কত ভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল। দলে দলে লোক আম্রকাননের দিকে চলিয়াছে। নগরের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য, ধর্ম্মপিপাসু, পুণ্যকথা শুনিবার জন্য পীড়িত রোগ উপশমের জন্য বিষয়ী ধনী যশ প্রার্থী হইয়া, নিঃসন্তান পুত্রকামনায়, শোকার্ত্ত সান্ত্বনার জন্য, পাপী-তাপী দয়ার জন্য, পতিত উদ্ধারের

জন্য সেখানে উপস্থিত হইতে লাগিল। সকলেই আপন আপন প্রার্থনা তথাগতকে জ্ঞাপন করিল।

বুদ্ধদেব এবং তাঁহার শিষ্যগণ সকলকে সদুপদেশদানে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। নগরের কত ধনী বুদ্ধদেব এবং তাঁহার শিষ্যগণকে নিজ নিজ আলয়ে আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। সেই সুপ্রশস্ত আম্র-কাননে কয়েকদিন ক্রমাগত জনস্রোত দেখা যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন দেখা গেল, একটি রমণী অতি কাতরভাবে তথাগতের দিকে মৃদুগতিতে গমন করিতেছে। রমণীর বেশ ভূষা নাই। কিন্তু তাহাতে কি? তাহার হীন বেশের মধ্য হইতেও সৌন্দর্য্যের আভা প্রকাশ পাইতেছে। তাহার মুখ ম্লান; যেন আত্মগ্লানি-ক্লিষ্ট। সেই রমণীকে এমত অবস্থায় দেখিয়া সমবেত নাগরিকগণের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল। উহারা অনেকে আপনাদের মধ্যে অস্ফুটস্বরে উহার নাম উচ্চারণ করিয়া তাহার আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু কেহ সাহস করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিতেছে না, পাছে পূর্ব্ব পরিচয় প্রকাশ পায়। অনেকে তাহাকে বুদ্ধদেবের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। কোন কোন বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া গণিকার তাদৃশ সাহসের নিন্দা ও প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কেহ

বা তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিল—আপনারা কাহার বাগানে আসিয়াছেন ? জানেন না, ইহা যে আম্রপালীর প্রসিদ্ধ উদ্যান। আম্রপালী বৈশালীর একজন প্রসিদ্ধ গণিকা।

আম্রপালী নিজকৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। নবধর্ম্মের কথা শুনিয়া সে আশান্বিতা হইয়াছে। স্বয়ং বোধিসত্ত্ব তাহার উদ্যানে পদার্পণ করিয়াছেন শুনিয়া সে কৃতার্থ হইয়াছে। আজ তাহার হৃদয় নানাভাবে পূর্ণ। সে পাপের ভার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সমাজের উপেক্ষা, অবজ্ঞা এবং অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইয়া, পরিত্রাণের নিমিত্ত বোধিসত্ত্বের শরণ লইতে যাইতেছে। নগরের গণ্যমান্য যাহারা, এক সময়ে গোপনে তাহার সঙ্গ লাভের জন্য কতই প্রয়াসী ছিল এখন তাহারা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সঙ্কুচিত। অধিকন্তু তাহার নিন্দাবাদ করিতেছে। বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে যাইবে—সে পথে বাধা দিতে উদ্যুক্ত। আম্রপালী এই সকল কপট আচরণ লক্ষ্য করিল। শেষে আম্রপালী বুদ্ধদেবের চরণে উপস্থিত হইল। তাঁহার নিকট সকল কথা অনুতপ্ত হৃদয়ে ব্যক্ত করিল। তথাগত তাহাকে ধর্ম্মের অভয়বাণী শুনাইলেন। সে ধর্ম্মের শরণ লইল। কথিত আছে ভগবান বোধিসত্ত্ব সশিষ্যে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং পরে সে বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রীত্যর্থে তাহার সেই বিশাল আম্র-কানন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল।

বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভের পর ৪৫ বৎসর স্বীয়ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। প্রতি বৎসর বর্ষার কয়েক মাস কোন না কোন বিহারে বাস করিতেন। জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি ভোগনগরে আনন্দ চৈত্যে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং ভিক্ষুগণকে নানা উপদেশ দেন। এখান হইতে তথাগত "পাওয়া" নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে চুন্দ নামক একজন কর্ম্মকারের বিশাল আম্র-কাননে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চুন্দ এই সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হইল এবং আপনাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিল।

বোধিসত্ত্বের তথায় অবস্থানকালে, একদিন চুন্দ তাঁহাকে শিষ্যগণের সহিত তাহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। চুন্দের নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিলেন। এদিকে চুন্দ তথাগতের এই অনুগ্রহ লাভ করিয়া হৃষ্টমনে গৃহে গমন করিয়া নানা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিল। এই সকল মাংসের মধ্যে বরাহ মাংসে প্রস্তুত খাদ্যও ছিল। আহারের সময় তথাগত এই সংবাদ অবগত হইলেন। পাছে ভক্ত চুন্দ দুঃখিত হয় এই জন্য তাহার প্রদত্ত আহার্য্য ফিরাইয়া দিলেন না। তিনি স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন কিন্তু ভিক্ষুগণকে উহা দিতে নিষেধ করিলেন। চুন্দ তাহাই করিল।

চুন্দের গৃহে এই দুষ্পাচ্য মাংস আহার করিয়া তিনি

পীড়িত হইলেন। তাঁহার রক্তআমাশয় রোগ দেখা দিল। কিন্তু পাছে চুন্দ এই সংবাদে লজ্জিত এবং দুঃখিত হয় এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিলেন দেখিও চুন্দ যেন মনে না করে, যে, সে, আমার এই পীড়া কারণ। নিরঞ্জনা তীরে সুজাতা প্রদত্ত পরমান্নে আমি তৃপ্ত হইয়াছিলাম - চুন্দের প্রদত্ত খাদ্যেও আমি তদনুরূপ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। কি উদার হৃদয়! মহাপ্রাণগণ চিরকাল ক্ষমার জন্য পূজিত হইয়া থাকেন।

ভগবান বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এই ভাবে শত্রু, মিত্র, উচ্চ, নীচ, পূত, পতিত, সকলকে সমভাবে ক্ষমা, ঔদার্য্য এবং প্রেমের চক্ষে দেখিতেন - এবং তাহাদের সহিত সেইরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সদয়, সহৃদয়, ব্যবহারে জনসাধারণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার উপদেশ শুনিত এবং নবধর্ম্মে জয় ঘোষণা করিত।

পরিনির্ব্বাণ।

তথাগত চুন্দের আম্র-কানন হইতে পীড়িত অবস্থাতে কুশীনগর যাত্রা করিলেন। এদিকে তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাও শেষ হইয়া আসিল। কুশীনগরের শালবনে তথাগত উপস্থিত হইলেন। সেই বনভূমি অতি রম্যস্থান। ভীমকায় শালবৃক্ষ সকল ঊর্দ্ধশীর্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মুক্ত আকাশে মৃদু বায়ু সঞ্চলনে তাহাদের পত্রগুলি সন্ সন্ করিতেছে। আজি বৈশাখী পূর্ণিমা। চারিদিক জ্যোৎস্নাস্নাত। পত্রাবলী ভেদ করিয়া জ্যোৎস্না বনভূমিতে পতিত হইয়াছে। বৃক্ষতল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শ্যামদূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত। প্রকৃতি যেন সেই মহাপুরুষের অভ্যর্থনার জন্য সকল আয়োজন পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখিয়াছিলেন। জ্যোৎস্না প্লাবিত বনভূমি। মৃদুমন্দ সমীরণ, নানা পুষ্প হইতে সুরভি বিতরণ করিতেছে। বৃক্ষের উচ্চ শাখায় হরিৎপত্রগুচ্ছের মধ্যে লুকায়িত থাকিয়া পাপিয়া স্বর-লহরীতে দিগন্ত প্লাবিত করিতেছে। চন্দ্রমার স্নিগ্ধ-কৌমুদী, বনপুষ্পের সুরভি, বিহগের সঙ্গীত, সমীরণের মৃদু সঞ্চলন একত্র হইয়া সেখানে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সে সৌন্দর্য্য, সে শোভা, সে শান্তি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; তাহা কেবল শান্ত সমাহিত চিত্তে অনুভব যোগ্য।

ভগবান বোধিসত্ত্ব মহাপ্রস্থানের সময়ে এইরূপ সৌন্দর্য্য শোভা ও শান্তির মধ্যে শয়ন কয়িয়া আছেন। ক্বচিৎ সমাধিস্থ হইয়া তিনি এক অনন্ত শিব সুন্দর ভাবে বিভোর হইতেছেন ক্বচিৎ জাগ্রত হইয়া সমবেত শিষ্য মণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ভক্ত শিষ্যগণ অনিমেষ নয়নে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার সেই ভগবানের শ্রীমুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি যখন ধ্যান নিমীলিতনেত্র হইতেছেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে কি এক অপূর্ব্ব শ্রী প্রতিভাত হইতেছে—বোধ হইতেছে জগতের অনন্ত শিব সুন্দর ও সত্য ভাব আত্মস্থ করার জন্য তাহাদের দিব্যজ্যোতিঃ সেই মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হইতেছে। আবার যখন জাগ্রত হইয়া উন্মিলিত নেত্রে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন তখন তাহার সেই আনন্দোজ্জ্বল নয়নদ্বয় যুগপৎ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। প্রেমের করুণ-কিরণ—স্নিগ্ধজ্যোতিঃ এবং সত্যের তীব্র রশ্মি যুগপৎ তথা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। ভক্ত ভিক্ষুমণ্ডলী তাঁহার কোন মূর্ত্তি অধিক মনোরম তাহার স্থির করিতে পারিতেছেন না।

ক্রমে তথাগতের জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। এই সময়ে তিনি সমস্ত ভিক্ষু মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—হে ভিক্ষুগণ? সকল পদার্থই সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন। সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেই

ধ্বংসশীল। এই সত্য আপনারা সতত স্মরণ করিবেন; এবং সর্ব্বদা সাবধান হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিবেন। আপনাদিগের প্রতি ইহাই আমার শেষ উপদেশ।

এই উপদেশ দিয়া ভগবান তথাগত পুনরায় ধ্যাননিমগ্ন হইলেন। জগৎ সংসার অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর, সংজ্ঞা এবং অসংজ্ঞা উভয়ই মিথ্যা, আকাশ সর্ব্বব্যাপী অসীম, জ্ঞান অনন্ত এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বুদ্ধদেব দেহবন্ধন মুক্ত হইয়া অনন্তে লীন হইলেন।

কপিলবাস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া জগতকে মুক্তির নূতন পথ দেখাইয়া শেষে কুশীনগরে এই ভাবে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

বন্দনা ।

"হয়ে রাজপুত্র, ছেড়ে রাজভোগ,
নবীন বয়সে বোধিসত্ত্ব যোগ,
করিলা অভ্যাস হয়ে চিরযোগী
কাম ক্রোধ অরি হলো বিজয়

২

পরণে কৌপীন, কমণ্ডলু করে,
দেববৎ হাস্তে, আস্ত শোভা করে,
প্রশান্ত বদনে, সুবিমল কান্তি,
হেরিলে মুনির মানস হরে ।
বুদ্ধ অবতার, মহিমা অপার,
যোগীন্দ্র যোগেতে, সদা মগন
মায়দেবী সুত নানাগুণযুত
মর্ত্তে নররূপে নৃপ নন্দন ।
জয় গুণাকর শোক তাপ হর
জগতে পবিত্র তোমার নাম ।"

সমাপ্ত ।

ভারত-গৌরব গ্রন্থাবলী

(প্রকাশিত হইয়াছে)

রামমোহন রায়।

বিদ্যাসাগর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

মহামতি রাণাড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র।

দয়ানন্দ সরস্বতী।

রামতনু লাহিড়ী।

কেশবচন্দ্র।

সিদ্ধার্থ।